Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সমীক্ষণ

অষ্টম বর্ষ ❖ সংখ্যা ২ ❖ ডিসেম্বর ২০১৮

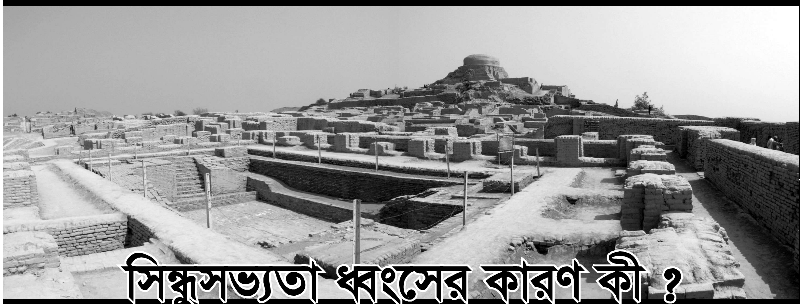

সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ কী ?

- ■ আফ্রিকা মহাদেশ ভেঙে দুই টুকরো হতে চলেছে
- ■ ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ
- ■ আবিষ্কারের গল্প ঃ উড়োজাহাজ
- ■ ক্লোন পদ্ধতি – এবার বানরের মধ্যে সাফল্য পেল
- ■ ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে টেলিস্কোপ ব্যবহারের চারশো বছর

প্রতিবন্ধকতাই অনুপ্রেরণা

চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

বিশেষ রচনা ঃ
- চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ ৩
- সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ কী ? ৭
- আফ্রিকা মহাদেশ ভেঙে দুই টুকরো হতে চলেছে ৯
- প্রতিবন্ধকতাই অনুপ্রেরণা ১০

আবিষ্কারের গল্প ঃ
- **উড়োজাহাজ** ১২

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ
- মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ ১৭

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ ২৩-৩৪
- মহাবিশ্বের দূরতম নক্ষত্রের সন্ধান ... ২৩
- ক্লোন পদ্ধতি – এবার বানরের মধ্যে সাফল্য ... ২৬
- ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে টেলিস্কোপ ব্যবহারের চারশো বছর পূর্ণ ২৮

চিঠিপত্র ঃ ৩০

পাঠকের কলাম ঃ
- **অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রচার করে কারা ?** ৩১
- **গ্রহণ ঃ গ্রহ-উপগ্রহে আলো-ছায়ার খেলা** ৩২

গল্প ঃ
- **পূর্ণিমাতে ঘোর অমাবস্যা** ৩৫

বিজ্ঞানের খবর ঃ ৩৭

সংগঠন সংবাদ ঃ ৪০

সম্পাদকীয় ঃ

দেখতে দেখতে ৮ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ২০১১ সালে বিজ্ঞান মনস্ক, পশ্চিমবঙ্গের মুখপত্র সমীক্ষণের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। দীর্ঘ ৮ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এবং অন্যান্য রাজ্যের অনেক মানুষ সমীক্ষণ'কে আপন করে নিয়েছেন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে সমীক্ষণ নিয়মিত প্রকাশ করা যায় নি। এবছরও মাত্র ২ বার পত্রিকা প্রকাশিত হল। সমাজের ব্যাপক মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে মতবাদিক সংগ্রাম প্রধান বিষয় আর মুখপত্র হল এই সংগ্রামের মুখ্য হাতিয়ার। আমরা এই কাজ সফলভাবে করতে পারি নি। এরজন্য সদস্য, পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদের সমস্ত সমালোচনা আমরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে আগামী বছর থেকে সমীক্ষণ ফেব্রুয়ারি, মে, অগাস্ট এবং নভেম্বরে অর্থাৎ বছরে ৪ বার নিয়মিত প্রকাশিত হবে। এবছরের ন্যায় প্রতিবছর আমাদের ইংরাজি মুখপত্র INSIGHT প্রকাশিত হবে মার্চ মাসে। এই সিদ্ধান্ত পালনে আমরা বদ্ধপরিকর। এই কাজ সফলভাবে করতে সমস্ত পাঠকদের কাছে আহ্বান – বকেয়া দাম পরিশোধ করুন, নিয়মিত চিঠিপত্র, রচনা, রিপোর্ট পাঠান এবং সমীক্ষণ ও INSIGHT কে সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। ■

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

নভেম্বর মাস থেকে শীতকালীন মরশুমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন বইমেলা এবং পত্রিকার স্টলগুলিতে সমীক্ষণ ও INSIGHT পাওয়া যাবে। সমীক্ষণ ও INSIGHT পড়ুন ও পড়ান।

বিশেষ রচনা ঃ

চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ

মহাকাশ নিয়ে মানুষের কল্পনার কোন শেষ নেই, জিজ্ঞাসার ও কোন সীমা পরিসীমা নেই। মহাকাশ সম্বন্ধে মানুষ যত জানছে, কৌতূহলও তত বাড়ছে। মানব সভ্যতার উষা লগ্নের মাথার উপরের সেই নীল আচ্ছাদনটা, সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ধীরে ধীরে সীমাহীন ক্রমশ প্রসারমান মহাকাশে পরিণত হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের জগতে মহাকাশ বিজ্ঞান বোধহয় মানুষের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়। রাতের অন্ধকারে আকাশের গায়ে ফুটে থাকা অযুত নিযুত আলোক কণার সম্ভার আমাদের অভিভূত করে, উস্কে দেয় আমাদের অনুসন্ধিৎসু মনকে। আর আমাদের গ্রহের নিকটতম মহাজাগতিক প্রতিবেশী চাঁদ? তাকে নিয়ে মানুষের আবেগের কোন শেষ নেই। কত গল্প, কত কবিতা, কত রচনা সৃষ্টি হয়েছে চাঁদকে নিয়ে তার হিসাব কেউ রাখেনি। শৈশবে মাতৃক্রোড়ে শুয়ে মায়ের মুখে 'আয় আয় চাঁদ মামা' বা 'চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা' এ কথা শোনেনি এমন শিশু আছে নাকি? আর এই ভাবেই 'সর্বজনীন চাঁদমামা'র সঙ্গে আমাদের গড়ে ওঠে এক নিবিড় সম্পর্ক – গড়ে ওঠে তাকে জানার এক অদম্য কৌতূহল।

এই কৌতূহলই ধীরে ধীরে মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে চাঁদের কাছাকাছি। তারপর একদিন ঘটে গেল সেই মহামিলন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ঘটে যাওয়া মানুষের চন্দ্রবিজয় বিজ্ঞানের তথা মানব সভ্যতার বিকাশের পথে এক উজ্জ্বল মাইল ফলক। তবুও একে ঘিরে রয়েছে চরম সন্দেহ, চক্রান্তের অভিযোগ, অবিশ্বাস, প্রতারণার অভিযোগ। সে অভিযোগ মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' তথা আমেরিকা সরকারের বিরুদ্ধে। বলা হয়েছে, চন্দ্রবিজয়ের প্রস্তুতির সময় থেকে আজ পর্যন্ত নাসা'র দ্বারা প্রকাশিত সমস্ত ছবি, ভিডিও – সবই নকল। হলিউডের সাহায্যে, তৈরী করা মঞ্চে অভিনীত নাটক যা বিশ্বের মানুষকে বোকা বানানোর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশ গবেষণার অগ্রগতিকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য এক মার্কিনী কৌশল। সোভিয়েতের সাথে মহাকাশ–দৌড় প্রতিযোগিতায় পাল্লা দেওয়া ও যেন তেন প্রকারেণ সেই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থেকে সোভিয়েতের সাফল্যকে খাটো করাই ছিল নাসা'র লক্ষ্য। যাই হোক, অভিযোগকারীদের যুক্তিগুলি ও সেই বিষয়ে নাসা'র প্রত্যুত্তরগুলির বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে মানুষের চাঁদে অবতরণের রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলি একটু জেনে নেওয়া যাক।

১৯৬১ সাল, মে মাসের ২৫ তারিখ, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি মার্কিন কংগ্রেসে বললেন চাঁদে মানব অভিযানের পরিকল্পনার কথা। আর, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ সালে হাউটন রাইস বিশ্ব বিদ্যালয়ের সুবৃহৎ প্রেক্ষাগৃহে প্রায় ৩৫ হাজার দর্শক মন্ডলীর সামনে প্রথমবার জনসমক্ষে জন কেনেডি ঘোষণা করলেন, 'এই শতকের শেষের দিকেই মানুষ চাঁদে পদার্পণ করবে এবং সেই প্রথম মানুষটি হবেন অবশ্যই একজন মার্কিন। আমরা মহাকাশ গবেষণায় সোভিয়েত রাশিয়ার পিছনে থাকতে চাইনা।' এর সাত বছর পর ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই মার্কিন সময় ৯টা ৩২ মিনিটে মার্কিন মহাকাশ যান এপেলো-১১, স্যাটার্ন V রকেটে চড়ে নির্বাচিত তিন নভোশ্চর **নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন বাজ অল্ড্রিন** ও **মাইকেল কলিন্সকে** সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করে চাঁদে অবতরণের উদ্দেশ্যে। মহাকাশযানটি উৎক্ষেপনের পর প্রথমে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে ও ধীরে ধীরে চাঁদের কক্ষপথে কম্যান্ড মডিউল 'কলম্বিয়া'কে স্থাপন করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। চাঁদের কক্ষপথে ঘূর্ণাবস্থায় 'কলম্বিয়া' থেকে লুনার মডিউল 'ঈগল' বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদে অবতরণের উদ্দেশ্যে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে প্রবেশ করে। কম্যান্ড মডিউলের চালক মাইকেল কলিন্স 'কলম্বিয়া'তেই থেকে যান ও অন্য দুই নভোশ্চর আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন লুনার মডিউলে চন্দ্রাভিমুখে রওনা হন। পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরুর প্রায় ১০২ ঘন্টা পর মার্কিন সময় বিকেল ৪টা ১৭ মিনিটে 'ঈগল' চাঁদের মাটি স্পর্শ করে। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের ঐ জায়গাটির নাম 'সী অব ট্রাংকুইলিটি' অর্থাৎ শান্ত সমুদ্র যা আসলে লাভা দ্বারা নির্মিত

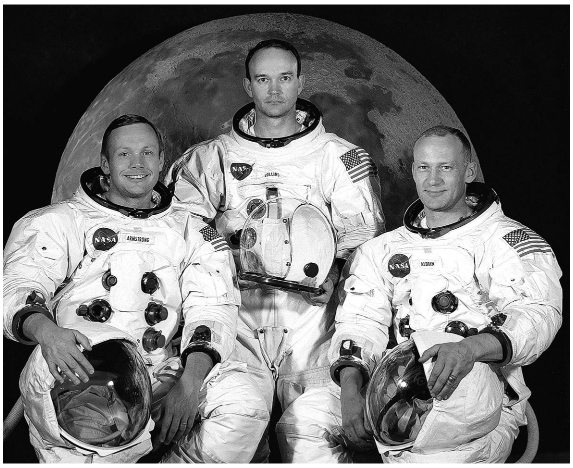

নীল আর্মস্ট্রং, বাজ অল্ড্রিন, মাইকেল কলিন্স

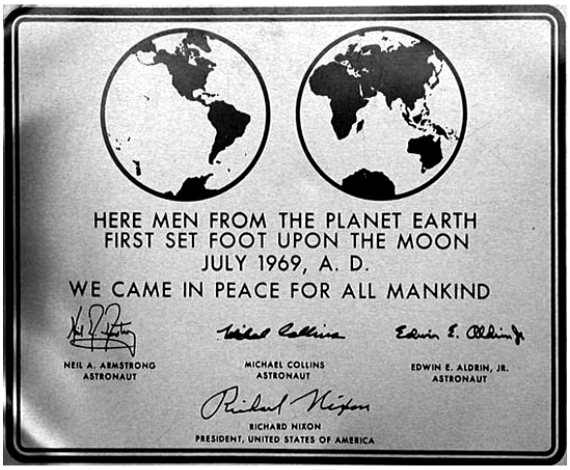

চাঁদে রেখে আসা বার্তা

একটা নিচু, সমতল অঞ্চল। চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণের প্রায় সাড়ে ছয় ঘন্টা পর নভোশ্চরেরা 'ঈগল'-এর মধ্য থেকে বের হয়ে চাঁদের মাটিতে নেমে আসেন। **কমান্ডার নীল আর্মস্ট্রং-ই হলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ যিনি চাঁদের মাটিতে পা রাখেন। আর দ্বিতীয় মানুষটি ছিলেন বাজ অলড্রিন।** সারা পৃথিবীর মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখলেন সেই ঐতিহাসিক 'ছোট্ট পদক্ষেপে' আর্মস্ট্রং পা ফেললেন চাঁদের মাটিতে। এই ঘটনাকে মানব জাতির মহাউল্লম্ফন হিসাবে ব্যক্ত করা হয়। *That's one small step of a man, one giant leap of mankind.* চাঁদের মাটিতে নেমেই নভোশ্চরেরা অনুভব করেন চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। হিসেব করে দেখা গেছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। প্রথমেই তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাটি চাঁদের মাটিতে পুঁতে দেন, প্রায় ২২ কেজি চাঁদের মাটি সংগ্রহ করেন, প্রচুর স্থির চিত্র ও চলমান চিত্র অর্থাৎ ভিডিও তোলা হয়, বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। এ সবই ছিল পূর্বপরিকল্পিত। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করে নভোশ্চরেরা লুনার মডিউলে ফিরে আসার আগে চাঁদের মাটিতে রেখে আসেন একটি স্মারক ফলক যাতে লেখা ছিল, "আমরা পৃথিবীর মানুষ, প্রথমবার পদার্পণ করলাম চাঁদের মাটিতে, জুলাই, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ। সমস্ত মানবজাতির শান্তি উদ্দেশ্যে আমরা এসেছিলাম।"

২১শে জুলাই মার্কিন সময় দুপুর ১টা ৫৪ মিনিটে, লুনার মডিউল চাঁদের আকাশে উড়ে যায় চাঁদের কক্ষপথে চক্কর খেতে থাকা কমান্ড মডিউলের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য যেখানে সঙ্গীদের ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন মাইকেল কলিন্স। অতঃপর ২২শে জুলাই মডিউলটি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে ও প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে অবতরণ করে। পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার পর নভোশ্চরদের আঠারো দিন রোগ-অন্তরণ বা quarantine প্রক্রিয়ায় রাখা হয় সম্ভাব্য সংক্রমণকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য।

স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, এটা কি কোন ভোজবাজী? নাকি কোন মহান জাদুকরের জাদুদন্ডের ছোঁয়ায় মানুষ উড়ে গিয়ে পড়ল চাঁদের মাটিতে? না, চাঁদে পা রাখার স্বপ্ন মানুষ একদিনে দেখেনি। দীর্ঘদিনের লক্ষ লক্ষ বিজ্ঞান সাধকের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল এই চন্দ্রাভিযান। সমাজ বিকাশের অগ্রগতি ও তার সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সোপানে চড়ে মানুষ পৌছে গিয়েছিল চাঁদের মাটিতে। সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথ ধরে একটু ঘুরে আসা যাক।

* ১৬০৯ সাল – ল্যান্স লিপারসে আবিষ্কার করেন দূরবীন। সেটাই হল মানুষের মহাকাশ চর্চায় হাতেখড়ি।

* ১৬১০ সাল – বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সর্বপ্রথম দূরবীনের সাহায্যে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করেন ও থমাস হ্যারিওটের সাহায্যে চাঁদের ছবি আঁকেন।

* ১৬৪৫ সাল – মাইকেল ফ্লোরেন্ট ভ্যান লাঙ্গেন চাঁদের মানচিত্র তৈরি করেন।

* ১৭৫১ সাল – গিওভ্যানি বাতিস্তা চাঁদের গিরিখাদের নামকরণ করেন বিভিন্ন দার্শনিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নামানুসারে।

* ১৭৫৩ সাল – রজার জোসেফ বস্কোভিচ তত্ত্বগতভাবে প্রমাণ করেন চাঁদে কোন বায়ুমন্ডল নেই।

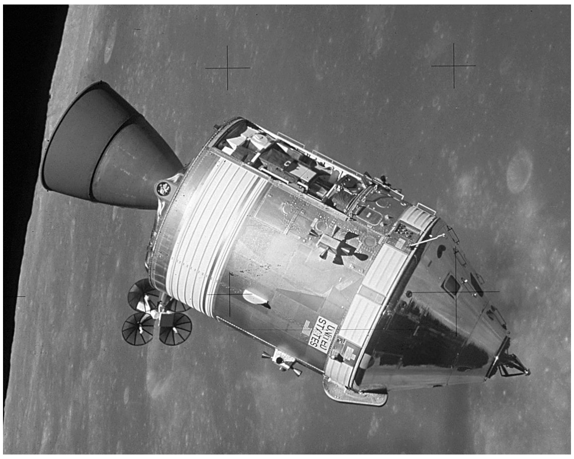

কম্যান্ড মডিউল

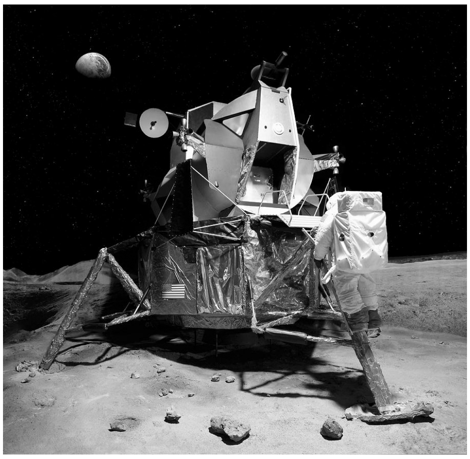

লুনার মডিউল

* ১৯৫৭ সাল – সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক - ১ মহাকাশে উৎক্ষেপন করে যা মহাকাশ থেকে সিগন্যাল পাঠাতে সক্ষম হয়। ঐ বছরেই স্পুটনিক - ২ মহাকাশে প্রথম প্রাণী লাইকা নামে একটি কুকুরকে পাঠানো হয়।

* ১৯৫৮ সাল – মার্কিন মহাকাশযান ভ্যান অ্যালেন বেল্ট-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে।

* ১৯৫৯ সাল – লুনা-১ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে ও সৌর ঝড়ের উপস্থিতি প্রমাণ করে। ঐ একই বছরে লুনা-২ চাঁদে পৌঁছায় ও অটোলাইকাস গিরিখাদের কাছে আছড়ে পড়ে। এক্সপ্লোরার – ৬ পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর ছবি পাঠায়। লুনা ৩ চাঁদের উল্টো দিকের ছবি পাঠায়।

* ১৯৬১ সাল – মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'নাসা' হ্যাম নামে এক শিম্পাঞ্জিকে মহাকাশে পাঠায়। সোভিয়েত মহাকাশযান ভস্তক-১-এ চড়ে প্রথম মানুষ ইউরি গ্যাগারিন পৃথিবীর কক্ষপথে আবর্তন করে।

* ১৯৬৩ সাল – প্রথম মহিলা সোভিয়েত নভোশ্চর ভ্যালান্তিনা তেরেস্কোভা মহাকাশে গমন করেন।

*১৯৬৬ সাল – সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-৯ চাঁদের মাটিতে সফলভাবে ল্যান্ডিং করে ও চাঁদের অজস্র ছবি পাঠায়।

*১৯৬৮ সাল – মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপেলো-৮ তিনজন নভোশ্চরকে নিয়ে চাঁদের কক্ষপথে ১০ বার প্রদক্ষিণ করে।

* ১৯৬৯ সাল – মে মাসের ১৮-২৬ তারিখ অ্যাপেলো-১০ তিনজন নভোশ্চরকে নিয়ে চাঁদের মাটিতে অবতরণের চূড়ান্ত মহড়া দেয়, চাঁদের কক্ষপথে আড়াই দিন ধরে চক্কর দেয়। ঐ একই বছরের ১৬ই জুলাই তিনজন মার্কিন নভোশ্চরকে নিয়ে অ্যাপেলো-১১ চাঁদের অবতরণের জন্য পাড়ি দেয় ও চন্দ্রবিজয় করে ২৪শে জুলাই পৃথিবীতে ফিরে আসে।

'নাসা'র অ্যাপেলো-১১ ছাড়া চাঁদে আজ পর্যন্ত আরো ছয়টি মানব অভিযান হয়েছে – অ্যাপেলো-১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭। এর মধ্যে অ্যাপেলো-১৪ অভিযানে নভোশ্চরেরা অবতরণে ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক অভিযানেই তিনজন করে নভোশ্চর ছিলেন, যার মধ্যে একজন কম্যান্ড মডিউলে ছিলেন ও দুই জন চাঁদে অবতরণ করেন। অর্থাৎ, সাতটি অভিযানে মোট ১২ জন মানুষ চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছেন। মোট ৩৮১.৭২ কেজি চাঁদের মাটি ও পাথর সংগ্রহ করা হয়েছে, সর্বসাকুল্যে প্রায় ৩০০ ঘন্টা চাঁদের মাটিতে বিচরণ করেছে মানুষ। পৃথিবীর বিভিন্ন পরীক্ষাগারে চাঁদের মাটি নিয়ে হাজার হাজার পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছে, হাজার হাজার গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাগুলি থেকে জানা গেছে যে চাঁদে যে পাথরগুলি পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই লাভাজাত ব্যাসল্ট। এই ব্যাসল্ট পাথরগুলির সাথে পৃথিবীর সমুদ্রপৃষ্ঠের ব্যাসল্টের মিল আছে। এছাড়া আছে গ্যাব্রো, নরাইট, ট্রকটোলাইট ও অ্যানরথোসাইট। এগুলি সবই পৃথিবীকেও পাওয়া যায়। তবে চাঁদের পাথরের মধ্যে কোন জলীয় অনু বিশিষ্ট খনিজ (হাইড্রাস মিনারেল) যেমন মাইকা বা অভ্র এবং অ্যাম্ফিবোল পাওয়া যায় না।

মানুষ চাঁদের যায়নি এমন অভিযোগ ও তার জবাব

বহুদিন ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে এবং কিছু ব্যক্তি বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছিলেন এই বলে যে চাঁদে পদার্পণ করা মানুষের পক্ষে

অসম্ভব। বিভিন্ন ধর্মে উল্লিখিত চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা নিয়ে যা বর্ণিত আছে তা চিরায়ত ও সনাতন, তাকে পাল্টানো মানুষের কর্ম নয়। ১৯৭৬ সালে অবসরপ্রাপ্ত আমেরিকান নেভি অফিসার বিল কেসিং একটি বই প্রকাশ করেন যার নাম – We have never went to the moon : America's Thirty Million Dollar swindle. অর্থাৎ আমরা কখনই চাঁদে যাইনি, এটা আমেরিকার ত্রিশ মিলিয়ন ডলারের কেলেঙ্কারী। চক্রান্তের অভিযোগ জনসমক্ষে এল। বহু মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হল। ফলে বিষয়টি জনপ্রিয় হল। অভিযোগকারীদের অনেকেই শুধু অ্যাপেলো ১১ নয়, তার পরবর্তী সবকটি অভিযানকেই হলিউডি শ্যুটিং বলে প্রচার করেন। বিল কিসিং-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত অন্তত বিশ জন নামজাদা মানুষ বা নামজাদা সংস্থা নাসা'র চন্দ্রবিজয়কে চক্রান্ত ও সাজানো ঘটনা বলে দাবী করেছে, বই প্রকাশ করেছে, সিনেমা বানিয়েছে, ডকুমেন্টারি বানিয়েছে, টিভি সম্প্রচারের মাধ্যমে তাদের অভিযোগকে প্রমাণ করার প্রয়াস রেখেছে। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ১) মার্কাস অ্যালেন – ব্রিটিশ পত্রিকা 'নেক্সাস'-এর প্রকাশক, ২) উইলিয়াম ব্রায়েন – নিউক্লিয়ার প্রযুক্তিবিদ, ৩) জেমস কলিয়ার - মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক, ৪) ডেভিস পার্সি – টিভি প্রডিউসার, ৫) অ্যারন রনেন – সিনেমা প্রডিউসার ও পরিচালক, ৬) বার্ট সিব্রেল – ফক্স টেলিভিশন সংস্থার চিত্র পরিচালক, ইত্যাদি ইত্যাদি। এদের মধ্যে বার্ট সিব্রেল ও তার টিভি সংস্থা ফক্স টেলিভিশন চক্রান্তের অভিযোগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বেশ কয়েকটি সিনেমা বানায়। এগুলির মধ্যে A Funny thing happened on the way to the Moon (2001), Conspiracy Theory : Did we land on the moon? (2002) অন্যতম।

অভিযোগকারীদের পরিচয়ের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় এনারা কেউই মহাকাশ বিজ্ঞানী নন। পৃথিবীর কোন দেশের মহাকাশ বিজ্ঞানী বা কোন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আজ পর্যন্ত সরকারী বা বেসরকারীভাবে মানুষের চাঁদে অবতরণের ঘটনায় সংশয় প্রকাশ করেনি। এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়নের মহাকাশ গবেষণা সংস্থাও আজ পর্যন্ত কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেনি। চক্রান্তের অভিযোগকারীরা অ্যাপেলো-১১ অভিযানের সময় নাসা দ্বারা প্রকাশিত ছবি ও ভিডিওগুলির অসঙ্গতি নিয়েই মূল অভিযোগগুলি অনেন। অভিযোগ যাই উঠুক না কেন, 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন ও প্রত্যেকটি অভিযোগের যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। অভিযোগকারীদের মূল অভিযোগগুলি কি ছিল ও নাসা'র পক্ষ থেকে তার ব্যাখ্যা কি ছিল তা দেখে নেওয়া যাক।

অভিযোগ ১ ঃ চাঁদের বায়ুমন্ডল নেই, তাহলে নভোশ্চরেরা যখন চাঁদের মাটিতে আমেরিকার পতাকা পুঁতছিলেন পতাকাটি উড়ছিল কেন? শ্যুটিং-এর সময় কি স্টুডিও-র পাখাগুলি বন্ধ করতে ভুল হয়েছিল?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, চাঁদের বায়ুমন্ডল নেই। আর এই কারণেই আমেরিকার পতাকাটি বিশেষভাবে বানানো হয়েছিল যাতে পতাকাটি ছবিতে দৃশ্যমান হয়। একটা ওল্টানো L -আকৃতির ফ্রেম বানিয়ে তা থেকে পতাকাটি ঝোলান হয়েছিল। (প্রচ্ছদ চিত্র দ্রষ্টব্য) পতাকার কাপড়ের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম ধাতব তারের বুনন ছিল যাতে বায়ুহীন স্থানে পতাকাটি নেতিয়ে না পড়ে। ভিডিও দেখেও অনেকের পতাকাটি দুলছে ব'লে ভ্রম হতে পারে। আসলে পতাকাটি পাকানো অবস্থায় একটা লম্বা ক্যানিস্টারের ভিতর রাখা ছিল, যার থেকে বের করার সময় পতাকাটি কেঁপে উঠেছিল। ভালভাবে লক্ষ করলে বোঝা যাবে স্থাপন করার পর পতাকাটি স্বাভাবিকভাবেই একেবারেই স্থির হয়ে যায়।

অভিযোগ ২ ঃ ভিডিওতে দেখা যাচ্ছিল, নভোশ্চরেরা যখন চাঁদের মাটিতে হাঁটছিলেন তখন তাদের পায়ের চাপে ধূলো উড়ছিল। চাঁদের বায়ুমন্ডল নেই তবে ধূলো কি ভাবে উড়ছিল?

উত্তর ঃ ভিডিওতে ধূলো উড়তে দেখা গিয়েছিল। তবে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে যেভাবে ধূলো উড়তে দেখা যায় সেইভাবে উড়তে দেখা যায়নি। ভিডিওটি ভালভাবে দেখলে বোঝা যায় নভোশ্চরদের পায়ের চাপে ধুলিকণাগুলি সামান্য উপরে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে তা চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের কারণে নিচে নেমে আসে। বায়ুমন্ডল থাকলে তা অনেক্ষণ ভেসে থাকত যেমন পৃথিবীতে ঘটে থাকে।

অভিযোগ ৩ ঃ ছবিতে লুনার মডিউলটি একটা ভাঙাচোরা খেলনার মতো দেখতে। জোড়াতালি দেওয়া রাংতায় মোড়া। শ্যুটিং-এর যেমন নকল জিনিস ব্যবহার করা হয় ঠিক তেমন। এতে কি প্রমাণ হয় না পুরোটাই স্টুডিওতে বানানো?

উত্তর ঃ ওপর থেকে লুনার মডিউলকে দেখতে যেমনই হোকনা কেন, ওটি বিশেষভাবে বানানো। ওটা ছিল বহুস্তরীয় গঠন বিশিষ্ট। বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন রকমের ইন্সুলেটর বা তাপপ্রতিরোধক পদার্থ যেমন কাপ্টান ও মাইলার ফিল্ম দিয়ে বানানো। এগুলি সৌরতাপ ও সৌরবিকিরণ থেকে মহাকাশচারীদের রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

অভিযোগ ৪ ঃ আমরা সবাই জানি নীল আর্মস্ট্রং প্রথম চাঁদে নেমেছিলেন, তাহলে তাঁর চাঁদে নামার প্রথম ছবিটি কে তুলেছিলেন?

বিশেষ রচনা ঃ

সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ কী ?

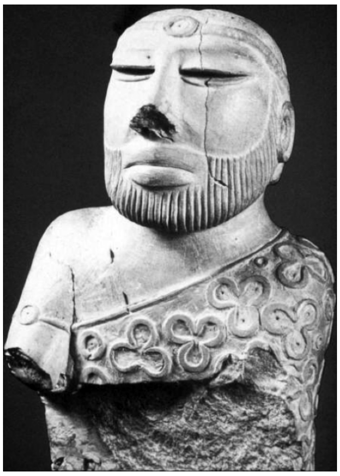

দক্ষিণ এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম নগরকেন্দ্রীক সভ্যতা হল সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে ওঠা এই মানব সভ্যতার বিস্তার ছিল উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে বর্তমান ভারতের গুজরাত, পশ্চিমে বর্তমান পাকিস্তানের বালুচিস্তান থেকে পূর্বে ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানার পশ্চিমপ্রান্ত (চিত্র দ্রষ্টব্য)। নতুন নতুন খননকার্য থেকে এর বিস্তার বর্তমানে আরও বিস্তৃত বলে ধারণা করা হয়। এই সভ্যতার বড় অংশ বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত। এই সভ্যতার প্রধান দুইটি নগর – হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত। ঐতিহাসিকরা মনে করেন ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেহরগড়ই ছিল এই সভ্যতার উৎস। তবে খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০-১৯০০ সময়কালই ছিল এই সভ্যতার মুখ্য সময়কাল। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো নামক নগর দুটি এই সময়কালে প্রসিদ্ধ নগরী ছিল।

সিন্ধু সভ্যতা (বিশেষতঃ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগর দুটিকে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায়) ছিল প্রাচীনকালের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত বৃহৎ নগর সভ্যতা। যেখানে ছিল অতি উন্নত পৌর পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা। মাটির পোড়া

●*চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ*

উত্তর ঃ এটা খুবই মজার প্রশ্ন। উত্তরটিও সহজ। আসলে লুনার মডিউলের গায়ে বিভিন্ন দিকে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা লাগানো ছিল। সেই ক্যামেরার সাহায্যেই নাসা'র প্রকাশিত অধিকাংশ ছবি তোলা হয়।

অভিযোগ ৫ ঃ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের বাইরের মহাকাশে 'ভ্যান অ্যালেন বেল্ট' নামে একটি স্তর আছে। যেখানে বিকিরণমাত্রা এত বেশি যে ঐ অঞ্চলে যে কোন বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। তাহলে মহাকাশচারীরা বেঁচে ফিরলেন কি করে?

উত্তর ঃ একথা সত্য যে পৃথিবীকে ঘিরে 'ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ স্তর' আছে এবং তা প্রাণীদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। স্তরটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তড়িতাহিত কণা দ্বারা গঠিত, যে কারণে স্তরটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। ঐ স্তর কোন কোন জায়গায় খুবই প্রবল আবার অনেক জায়গায় দুর্বল। দুর্বল অঞ্চলগুলি বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই সনাক্ত করেন ও উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাকাশচারীরা ঐ অঞ্চল দিয়ে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে পার হয়ে যায়।

অভিযোগ ৬ ঃ নাসা'র প্রকাশিত ভিডিওতে মহাকাশ-চারীদের স্লো-মোশনে হাঁটাচলা দেখানো হয়েছে যা মেশিনের কারিকুরি করে করা হয়েছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ কম প্রমাণ করার জন্য এটা নাসা'র কারসাজি।

উত্তর ঃ এটা প্রমাণ করতে অনেক বড় বড় প্রযুক্তিবিদ চেষ্টা করেছেন। উন্নত ক্যামেরায় স্লো-মোশনে কোন চলমান বস্তুকে দেখানো কোন বড় ব্যাপার নয়। তবে চাঁদের ধূলিকণার যে আচরণ নাসা'র ভিডিওতে ধরা পড়েছে তা আজ পর্যন্ত কেউ নকল করতে পারেনি।

অভিযোগ ৭ ঃ নাসা'র ছবিতে চাঁদের আকাশে কোনো তারা দেখা যাচ্ছে না কেন? চাঁদে তো বায়ুমন্ডল নেই, তাহলে তো আকাশে লক্ষ-কোটি তারা থাকার কথা ছিল?

উত্তর ঃ যারা এমন যুক্তি আনেন, জানেন না লুনার মডিউল চাঁদের সেই দিকে অবতরণ করেছিল যে দিকে সূর্যের আলো ছিল। তাই যে কারণে পৃথিবীতে দিনের বেলায় কোন তারা দেখা যায়না একই কারণে ছবিতে তারারা ছিল অনুপস্থিত। যদিও 'রাতের সব তারাই ছিল দিনের আলোয় ঢাকা'। চাঁদের অন্ধকার পিঠে অবতরণ করলে তা দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত। তবে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে তুলনায় বড় বস্তু পৃথিবীকে দেখা গেছে। যেমন পৃথিবী থেকে দিনের বেলাতেও আমরা চাঁদকে দেখতে পাই।

যাই হোক চাঁদের মানুষের অবতরণ নিয়ে এমন শত শত অভিযোগের কথা শোনা যায়। যার সব ক'টির উত্তর নাসা'র বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। বর্তমানে Third Party Evidence বা তৃতীয় পক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা গেছে আজ পর্যন্ত সমস্ত অবতরণের স্থান। সম্প্রতি ইউরোপিয়ান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ও এক জাপানী মহাকাশ গবেষণা সংস্থা চাঁদের মাটিতে প্রথম অবতরণের নিদর্শনগুলি চিহ্নিত করতে পেরেছে। ■

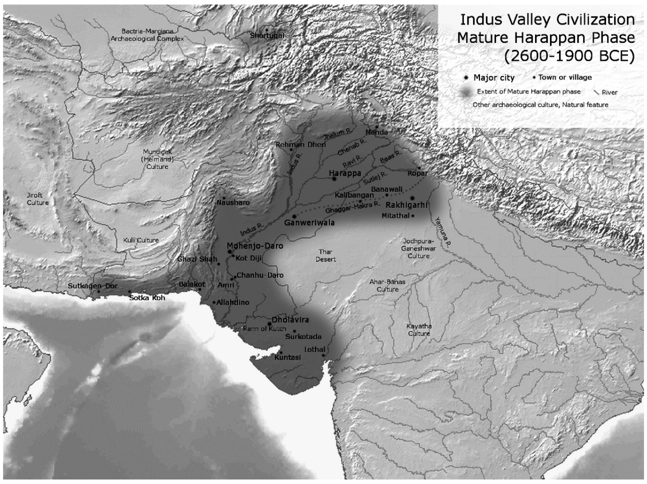

ইঁট দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ি, স্নানাগার, ড্রেন, রাস্তা দেখে, বিভিন্ন স্থাপত্য এবং শিল্পকলার পরিচয় দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ওই সভ্যতার অসংখ্য শিলালিপি পাওয়া গেছে যার পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। এগুলি পাঠ করা গেলে সে যুগের বহু অজানা ইতিহাস আমরা জানতে পারতাম। এই সভ্যতার যতটুকু ইতিহাস জানা গেছে তার সবই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে।

১৮৭২-৭৫ কালপর্যায় ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিক কামিংঘাম প্রথম এই অঞ্চলে নানান শিলালিপির খোঁজ পান। ১৯২১ সালে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা (এ এস আই)এর পক্ষ থেকে বর্তমান পাকিস্তানের হরপ্পায় জন হালবার্ট মার্শাল এর নেতৃত্বে রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানি এবং মাধো স্বরূপ ভাট প্রথম খনন কার্য শুরু করেন। এরপরই ১৯২২ সালে মহেঞ্জোদারোতে রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, জে এইচ ম্যাকে এবং মার্শালের নেতৃত্বে খনন শুরু হয়। আবিস্কৃত হয় বিশ্বের দুই উন্নত প্রাচীন নগরী। পরবর্তীকালে আহমেদ হাসান, ব্রিজবাসী লাল, ননী গোপাল মজুমদার প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই সভ্যতার বহু দিক আবিষ্কার করেন। সেদিন থেকে আজ অবধি সিন্ধু সভ্যতার নানা নিদর্শন ভারত এবং পাকিস্তানে আবিষ্কার হয়ে চলেছে।

এই সুপ্রাচীন উন্নত নগরকেন্দ্রীক সভ্যতা ধ্বংস হল কেন?

এই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা মত আছে। বিজ্ঞানী ডি. ডি. কোশাম্বি সহ একদল ঐতিহাসিকের মতে আর্যরা প্রাচীন ভারতে পরে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা যুদ্ধবিদ্যায় অনেক বেশি দক্ষ ও পারদর্শী ছিল। আর্যরা অশ্বের ব্যবহার জানত, সিন্ধু সভ্যতার নাগরিকরা নয়। তাই তারা প্রাচীন সিন্ধুবাসীর উপর আক্রমণে করে বিজয়লাভ করেছিল এবং তাদের সভ্যতা ধ্বংস করে দিতে সফল হয়েছিল। এই তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে আর্যদের রচিত অনেক প্রাচীন গ্রন্থে বৃহৎ নগরী জয়লাভের উল্লেখ আছে। অনেক মৃতদেহের কঙ্কাল পাওয়া গেছে ইত্যাদি। যদিও এই তত্ত্বের পক্ষে ব্যাপক গণহত্যার যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। কিছু যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা ঘটে থাকতেই পারে তবে তা যে এত বিশাল উন্নত সভ্যতার ধ্বংসের কারণ এটা প্রমাণ করার মত তথ্য নেই। এছাড়া প্লেগ সংক্রমণ বা বড় বড় ভূমিকম্পের কারণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসের যে যুক্তি পেশ করা হয় তেমন প্রমাণ neotectonic গবেষণায় (কয়েক হাজার বছরের মধ্যে ঘটা ভূ-আলোড়ণ) নেই। সিন্ধু সভ্যতার আকস্মিক ধ্বংসপ্রাপ্তির তেমন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই বরং এই সভ্যতার ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্তির এবং অন্য সভ্যতার সাথে ধীরে ধীরে মিলনের সঙ্গে বিলোপের প্রমাণই পাওয়া যায়।

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য তত্ত্বগুলি হল অঞ্চলের জলবায়ুর বিশাল পরিবর্তন অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংক্রান্ত।

অন্য একদল গবেষকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সময়কালে ঐ অঞ্চলে পরপর কয়েকবার প্রবল বন্যা হয়। এই বন্যায় নগরগুলির ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাত কমে যায় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলেই সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে।

একদল গবেষকদের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের সময়কালের কিছু পূর্বে ঘগ্গর এবং হরকা নদী ভূ-আলোড়ণের ফলে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করে। এর ফলে উপত্যকার আদ্রতা কমে যায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে জলবায়ুর পরিবর্তনে অঞ্চলের শুষ্কতা আরও বাড়ে এবং ক্রমে অঞ্চলটি মরুভূমিতে পরিণত হয়।

সম্প্রতি সিন্ধু সভ্যতার একদম উত্তরপূর্ব প্রান্তে ভারতের হরিয়ানার কোটলা-দহর অঞ্চলে একদল পুরাজলবায়ুবিদরা গবেষণা করে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন। কোটলা-দহর হল প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্গত একটি প্রাচীন প্রাকৃতিক হ্রদ অঞ্চল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াই দিক্ষীত এবং ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির অধ্যাপক

বিশেষ রচনা ঃ

আফ্রিকা মহাদেশ ভেঙে দুই টুকরো হতে চলেছে

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘটে চলা প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে এর থেকে বিস্ময়কর আর হয়ত কিছু নেই! আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব প্রান্তে কেনিয়া এবং ইথিওপিয়ার মধ্য দিয়ে প্রায় ৩০০০ কি.মি লম্বা এক গভীর ফাটল (Rift) ক্রমশ পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে চলেছে যার বৈজ্ঞানিক নাম East African Rift. এই ফাটল বাড়তে বাড়তে আগামী দিনে আফ্রিকা মহাদেশকে দুই টুকরো করে ফেলবে। কেনিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে সাম্প্রতিক ফাটলটি কয়েক মিটার বিস্তৃত হয়ে নাইরোবি-নারোক হাইওয়েকে কার্যতঃ ধ্বংস করে ফেলেছে। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষ করছেন প্রতি মুহূর্তে এই ফাটল বাড়ছে, মাঝে মাঝে চ্যুতির ঘটনা ঘটছে, বিভিন্ন মাত্রার ভূমিকম্প এবং কোথাও কোথাও লাভা এবং উষ্ণ জল নির্গত হচ্ছে।

ভূ-বিজ্ঞানীরা এই লম্বা ফাটলটিকে বলেন ইস্ট আফ্রিকান রিফ্ট। এই রিফ্ট হল এমন এক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা যেখানে ফাটলের দুই পাশের ভূমি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়। আমরা জানি পৃথিবীর ভূত্বক (Crust) এবং গুরুমন্ডল (Mantle) এর উপরিঅংশ শক্ত, স্থিতিস্থাপক, ভঙ্গুর কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত। একে বলে লিথোস্ফিয়ার। এই লিথোস্ফিয়ার কতগুলি ভাঙা টুকরোতে বিভক্ত যাদের টেকটনিক প্লেট বলে। এই প্লেটগুলি স্থির নয়, একে অন্যের তুলনায় গতিশীল বিভিন্ন গতিবেগে এবং তা ভাসমান আছে অর্ধতরল, গরম, ভিসকাস পদার্থের উপর, যাকে বলে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ার। প্লেটগুলির সরণের প্রকৃত কারণগুলি নিয়ে যদিও এখনও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক আছে তবুও তা যে অ্যাস্থেনোস্ফিয়ারের পদার্থের তাপের পরিচলন গতির ফলাফল, এবিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। প্লেটগুলির সীমান্ত অঞ্চলেই বলের সৃষ্টি হয় যা প্লেটগুলির সরণ ঘটায়। এই বল প্লেটের শুধুমাত্র সরণ ঘটায় না, প্লেটের মধ্যে ফাটল ঘটায়, রিফ্ট সৃষ্টি করে এবং ক্রমশ এই প্রক্রিয়ার পরিণতি হিসাবে নতুন প্লেট এবং প্লেট সীমান্তের জন্ম দেয়। ইস্ট আফ্রিকান রিফ্ট হল এমনই এক প্রাকৃতিক উদাহরণ যেখানে বর্তমানে এই প্রক্রিয়া চলছে।

EAR (East African Rift) উত্তরে এডেন উপসাগর থেকে দক্ষিণে জিম্বাবোয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০০ কি.মি। এই EAR আফ্রিকা মহাদেশকে কালক্রমে দুটি মহাদেশে ভাগ করবে, আফ্রিকা প্লেটকে দুটি প্লেটে বিভক্ত করবে – পূর্বের ক্ষুদ্রাকার সোমালি প্লেট এবং পশ্চিমে বৃহৎ নুবিয়ান প্লেট।

● *সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের কারণ কী ?*

অনিল গুপ্তা ঐ অঞ্চলের মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে শামুক সংগ্রহ করেন। রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে ওই শামুকগুলির খোলক [যা অ্যারাগোনাইট ($CaCo_3$) খনিজ দ্বারা গঠিত] থেকে তাদের বয়স যেমন নির্ধারণ করা হয় তেমনই ওই শামুকের খোলার মধ্যস্থিত অক্সিজেনের বিভিন্ন আইসোটোপ (O^{16} এবং O^{18}) নিয়েও গবেষণা করা হয়। আমরা জানি শুষ্ক আবহাওয়ায় O^{16} আইসোটোপ বেশি বাষ্পীভূত হয় এবং শামুকের খোলা ও মাটিতে O^{18} এর পরিমাণ বেড়ে যায়। অধ্যাপক দিক্ষীত এবং গুপ্তা মাটির বিভিন্ন স্তরের (নীচের গুলির বয়স বেশি) নমুনার O^{16} এবং O^{18} এর অনুপাত নির্ণয় করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে আজ থেকে ৪০০০-৪২০০ বছর আগেকার ২০০ বছর সময়কালে সিন্ধু নদী উপত্যকায় খরা চলেছে। এই দীর্ঘ খরার সময়কালে ধীরে ধীরে অঞ্চলের মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। এই সময়কালেই সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক জলবায়ু পরিবর্তনের চক্রের প্রভাবেই ঘটেছে। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে ওই সময়কালের খরার কারণ এখনও জানা যায় নি।

সামগ্রিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ এখনও চূড়ান্তভাবে আবিস্কৃত না হলেও সাম্প্রতিকতম গবেষণা আমাদের সত্যের অনেক কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ■

বিশেষ রচনা ঃ

প্রতিবন্ধকতাই অনুপ্রেরণা

বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর জন্ম হয়েছিল ১৯৪২ সালের ৮ই জানুয়ারি অক্সফোর্ড শহরে। ওটা ছিল গ্যালিলিও'র মৃত্যুর ঠিক ৩০০ বছর। এই সম্পর্কের বাইরে এই দুই বিজ্ঞানীর জীবনে আরেকটা বড় মিলের দিক লক্ষ করার মত। তখনকার প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে গ্যালিলিও'র মতের (সৌরমন্ডলের প্রকৃত ধারণা) জন্য তাকে যে প্রচন্ড সামাজিক বাধা এমনকি তার প্রাণ সংশয় হওয়ার মতো অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তেমনি হকিংকেও মোকাবিলা করতে হয়েছিল চূড়ান্ত দৈহিক প্রতিবন্ধকতা।

'ন্যাচারাল সায়েন্স'-এ ডিগ্রি নেওয়ার পর ১৯৬২ সালের অক্টোবরে হকিং ভর্তি হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অ্যাপ্লাইড ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স' বিভাগে। তখন থেকেই তিনি নিজে চলাফেরার দুর্বলতা লক্ষ করতে থাকেন কিন্তু কাউকে কিছু বলেন না। তার পিতা লক্ষ করলেন ছেলের চলাফেরাটা ঠিক নয় – বারবার কেমন পড়ে যাওয়ার প্রবণতা। তাই ডাক্তারখানায় নিয়ে যান। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করে এই পড়ে যাবার ঘটনা বা দুর্বলতার কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা। তখনই ধরা পরে সেই দুরারোগ্য ব্যাধির কথা। এর নাম সংক্ষেপে 'এ এল এস' বা 'এমাইওট্রফিক ল্যাটারাল স্কেরোসিস (Amyotrophic Lateral Sclerosis) বা মোটর নিউরন ডিজিস। কেন হয় এই রোগ? বলতে হবে বিজ্ঞান এখনো এর কোনো কারণ খুঁজে পায়নি। কি হয় এই রোগে? আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রীয় অংশ মস্তিষ্ক ও তার বিস্তৃতি সুষুম্নাকান্ড বা 'স্পাইনাল কর্ড' যেটা আমাদের মেরুদন্ডের মাঝখান বরাবর সুরক্ষিত থাকে। ওখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের হাত-পা।

● *আফ্রিকা মহাদেশ ভেঙে দুই টুকরো হতে চলেছে*

এখন প্রশ্ন হল – এই মহাদেশীয় রিফ্ট হয় কেন?

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, যখন লিথোস্ফিয়ারের উপর অনুভূমিক বল (horizontal extensional force) বেশি হয় তখন তা পাতলা হয়ে যায় এবং প্রসারিত হতে থাকে। সঙ্গত কারণেই এর ফলে ভূত্বকে ফাটল সৃষ্টি হয় এবং Rift valley (রিফ্ট উপত্যকা)-র সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় ফাটল সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প এবং অগ্নুৎপাত ঘটতে দেখা যায়। রিফ্ট হল মহাদেশের প্রাথমিক ভাঙনের পর্যায়কাল যা শেষ পর্যন্ত দুই বিভক্ত মহাদেশের মধ্যে সমুদ্রের জন্ম দেয়।

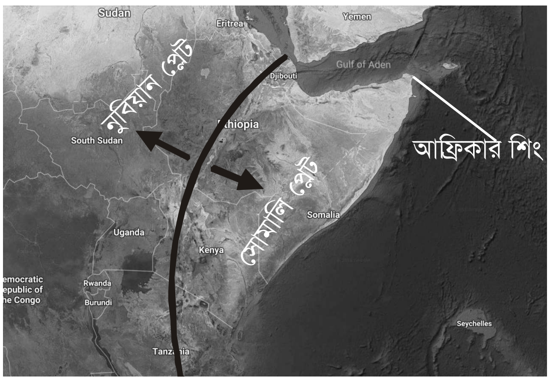

এইভাবেই আজ থেকে ১৩৮ মিলিয়ন (১৩ কোটি ৮০ লক্ষ) বছর আগে আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার (তখন সংযুক্ত মহাদেশ ছিল) মাঝে ফাটল সৃষ্টি হয়, ফাটলের ক্রমান্বয় সরণের বা rifting-এর ফলে মাঝ বরাবর আটলান্টিক মহাসাগরের জন্ম দিয়েছে।

জিওফিজিক্যাল গবেষণায় জানা গেছে যে EAR এর নিচে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ ম্যান্টল প্লিউম (গুরুমন্ডলের মধ্যকার উর্ধ্বমুখী লাভাস্রোত) আছে যা গোটা প্রক্রিয়ার শক্তির উৎস। প্লেটের ফাটল এবং পরস্পর বিপরীত দিকে সরণের জন্য যে বল সৃষ্টি হয়েছে তার উৎস ওই ম্যান্টল প্লিউম।

EAR বরাবর বিভিন্ন পর্যায়ে ফাটলের সৃষ্টি ও তার সরণ বিভিন্ন মাত্রায় হয়ে চলেছে। দক্ষিণ দিকে সৃষ্ট ফাটল অনেক নবীন এবং এখানে বিপরীতমুখী প্রসারণের মান তুলনায় কম। এই দিকে ভূমিকম্প এবং অগ্নুৎপাতের হারও তুলনায় কম। উত্তর দিকে সমগ্র রিফ্ট উপত্যকার ভূমি আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত। এটা প্রমাণ করে উত্তরাংশে লিথোস্ফিয়ার সবচেয়ে পাতলা এবং প্লেটের ভাঙন প্রক্রিয়া প্রায় শেষের মুখে। দক্ষিণাংশের ফাটলের বিস্তৃতি ঘটছে গড়ে বছরে ৬-৭ মি.মি। বিজ্ঞানীদের অনুমান আজ থেকে ১ কোটি বছর পর আফ্রিকা মহাদেশের ভাঙন হয়ে তার মাঝে সমুদ্রের জন্ম হবে। এর ফলে আফ্রিকা মহাদেশ পূর্বের তুলনায় ক্ষুদ্রাকার হবে এবং পূর্বে ভারত মহাসাগরের মধ্যে এক বৃহৎ দ্বীপ দেখা যাবে ইথিওপিয়া, কেনিয়া এবং সোমালিয়ার বড় অংশ এবং বিখ্যাত আফ্রিকার শিং নিয়ে।■

আবার হাত-পা শরীরের অনুভূতিও প্রথমে ওই 'স্পাইনাল কর্ড'-এই যায় সেখান থেকে মস্তিষ্কে সম্প্রসারিত হয়। চলৎশক্তির নিয়ন্ত্রক বলে সেই নির্দিষ্ট স্নায়ু কোশগুলিকে বলে মোটর নিউরন। আমাদের প্রত্যেকটি পেশী ওই নিউরনের আওতায় থাকে। মোট নিউরন ডিজিজ যেটাতে স্টিফেন হকিং আক্রান্ত হয়েছিলেন তাতে ওই মোটর নিউরনগুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। তার ফলে হাতে পায়ের পেশীগুলো কাজ করতে পারে না। এটা একসঙ্গে সমস্ত শরীরের মোটর নিউরন-এর ক্ষেত্রে ঘটে না। বিভিন্ন সময়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অংশের মোটর নিউরন খারাপ হয়। যখন যে অংশের খারাপ হয় তখন সেই অংশে পক্ষাঘাত বা প্যারালাইসিসের মত অবস্থা তৈরি হয় যেটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে যতক্ষণ না ওই মোটর নিউরন পুরো শেষ হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যণীয় হচ্ছে দেহ অচল হয়ে গেলেও মস্তিষ্ক পুরোপুরি সচল থাকে একেবারে শেষ অবধি।

ওনার ক্ষেত্রেও ১৯৬২ সাল থেকে ধীরে ধীরে এই ঘটনা চলতে থাকে এবং ১৯৬৯ সালে উনি হুইল চেয়ারে আবদ্ধ হয়ে পড়েন।

এইরকম দুরারোগ্য রোগে যখন কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হয় তখন প্রথম যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় সেটা হলো এটাকে পুরোপুরি অস্বীকার করা যে "হতেই পারে না এরকম আমার সঙ্গে"। তারপরে যখন বারবার একই জিনিস বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে প্রমাণিত হয় তখন চলে দ্বিতীয় অবস্থা যেখানে রোগী বিষণ্ণতার শিকার হয়ে সমস্ত আশাভরসা ছেড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করে। উনি নিজেই লিখেছেন প্রথম দিকের মনের খারাপ অবস্থাটা কেটে যায় যখন তিনি দেখেন তার সঙ্গে হাসপাতালে থাকা তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে লিউকেমিয়াতে আক্রান্ত যার বেঁচে থাকার কষ্ট যেমন বেশি তেমনি আয়ুও তার থেকে কম। তিনি ভাবেন যেহেতু কম সময় বেঁচে থাকা যাবে এবং তাই যা কাজ করার আছে সেটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এই সময় ফুরিয়ে যাবার তাড়নাকেই অনুপ্রেরণায় রূপান্তর করেন। ওনার ডক্টরেট ডিগ্রি আর বাকি যত গবেষণার কাজ উনি করেন সেসবই এর পরে। উনি লিখেছেন ধীরে ধীরে দেখা যায় চিকিৎসকরা যত দ্রুত খারাপ হবে বলেছিলেন তা হচ্ছে না বরং দিব্যি কাজ করে যাওয়া যাচ্ছে। নতুন উদ্যমে নতুন নতুন চিন্তা এবং কাজে উনি জড়িয়ে পড়েন। যে কাজের জন্য ওনার এত নাম – কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল ও রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতা, সেই কাজেও উনি নিবিড়ভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বড় বড় গবেষণা পত্র ৭১ সাল থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। 'লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার অফ স্পেস অ্যান্ড টাইম' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩-এ। 'ব্ল্যাক হোল এক্সপ্লোশন' প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে যেখানে চলতি ধারণার বিরুদ্ধে ব্ল্যাক হোল থেকে রেডিয়েশন বা বিচ্ছুরণের কথা বলেন যেটা পরে **হকিং রেডিয়েশন** নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। লম্বা তালিকার মাত্র ২টি উদাহরণ দিলাম।

চলচ্ছক্তি হারাবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে লেখার ক্ষমতাও কমতে থাকে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রকাশনা ও পড়ানো চলে – কিছুই থেমে থাকে না। প্রথমদিকে লেখাটা কোন সাহায্যকারীকে দিয়ে লেখানো হত যিনি ওনার ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা উচ্চারণগুলো বুঝতে পারতেন। কিন্তু ১৯৮৫ সালের পর ওনার ট্রাকিঅস্টমী বা শ্বাসনালীতে ফুটো করে জীবন রক্ষা করার চিকিৎসা প্রক্রিয়ার পরে ওনার বাক্ ক্ষমতাও হারিয়ে যায়। এরপর কম্পিউটারে ওনার মাথা মুখ এবং চোখের পেশীর সঞ্চালনে টাইপ করতেন একটা কম্পিউটারে। কিন্তু এতে সময় অনেক বেশি লাগতো মিনিটে ১৫টার বেশি লিখতে পারতেন না। এরপর ক্যালিফোর্নিয়ার একজন ইঞ্জিনিয়ার ওয়াল্ড ওয়ালটস ওনার জন্য একটা প্রোগ্রাম তৈরি করে ওনার কম্পিউটারে লাগিয়ে দেন যেটার নাম ছিল ইকুয়ালাইজার। এতে ওনার পছন্দের শব্দ এবং বাক্য চলে আসতো, হাতে মাউস এর মত একটা যন্ত্র চেপে উনি সেটা বাছাই করতেন। এই প্রযুক্তি এখন স্মার্টফোনে সবার কাছেই আছে। কিন্তু তখন সেটা অভাবনীয় ছিল। তার সঙ্গে আর একটি যন্ত্র যেটাকে বলে ভয়েস সিন্থেসাইজার সেটা ওই কম্পিউটার থেকে নেওয়া সেই সংকেত বা সিগন্যালকে শোনার যোগ্য কথায় রূপান্ত র করত। লেখা চলতে থাকলো আর সারা পৃথিবী ঘুরে বক্তৃতা দেওয়ার যেন কোন অসুবিধেই রইল না, অন্তত ওনার কাজের মাত্রা দেখে তাই মনে হবে। ওনার সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখা বই 'ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' সেই সময়ে ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এমন করে ওনার বইয়ের সংখ্যাও কম নয় সেটা শেষ হয়েছে মৃত্যুতে ২০১৮-তে। এই ১ মাস আগে বেরনো 'ব্রিফ অ্যানসারস টু দ্য বিগ কোশ্চেন্স' নিয়ে ১৫ খানা বই।

ইন্টেল কম্পিউটার প্রসেসর তৈরীর সংস্থা ১৯৯৭ থেকে ওনার এই লেখা ও কথা বলার যান্ত্রিক ব্যবস্থাটাকে উন্নত করে দেয়। কিন্তু ২০০৮ সালে হাতের সামান্য চাপ দেওয়ার ক্ষমতাটাও উধাও হয়ে যায়। তখন পুরো টাইপ করা এবং বাছাই করা মুখের পেশী সঞ্চালনে করতে হত। অবশ্য ইতিমধ্যে প্রযুক্তি অনেক উন্নত হয়ে যাওয়াতে ওনার লেখা ও কথা বলার বেগ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাধাকে পরাজিত করার যে অদম্য জীবনীশক্তি ওনার সারা জীবন ধরে আমরা দেখতে পাই হয়তো সেটাই ওনাকে এক বিরল উদাহরণ করেছে এই মোটর নিউরন ডিজিজ-এর রোগী হিসেবে, কারণ এত বেশি দিন প্রায় ৫৫ বছর এই রোগ নিয়ে বেঁচে থাকার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। শুধু বেঁচে থাকাই নয় বিজ্ঞানের জটিল চিন্তায় জ্ঞানের পরিধি যেমন বাড়িয়েছেন তেমনি উদ্দীপ্ত করেছেন অসংখ্য মানুষকে যা প্রতিকূলতায় মানুষকে এগিয়ে দেবার মূল অনুপ্রেরণা।■

আবিষ্কারের গল্প ঃ

উড়োজাহাজ

উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট

সৃষ্টির সেই আদি থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যে সব স্বপ্ন দেখে আসছে তার মধ্যে আকাশে ডানা মেলার স্বপ্ন সবচেয়ে পুরানো। সম্ভবত পাখিকে আকাশে ডানা মেলে উড়তে দেখে মানুষের মনে সাধ জাগে আমিও যদি ডানা মেলে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারতাম। তারপর বহুদিন ধরে অনেক মানুষের বহু কষ্ট, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে মানুষ আজ নির্দ্ধিধায় আকাশে ঘুরে বেড়াতে পারছে। দেশ হতে দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে। মহাকাশযানে চেপে চন্দ্রবিজয় সম্ভব হয়েছে। তবুও মানুষের মনে সেই আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় নি। এখনো প্রতিদিন চলছে নিরন্তর গবেষণা। বিজ্ঞানীরা নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন কিভাবে আকাশপথকে আরোও নিরাপদ ও আনন্দদায়ক করা যায়। কিভাবে আরো কম সময়ে দ্রুত পথ পাড়ি দেওয়া যায়।

এই বিমান বা উড়োজাহাজ আবিষ্কার কিন্তু বেশিদিনের না। বলা যায় একশ বছরের একটু বেশি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও কোনো উড়োজাহাজ আকাশে ডানা মেলে নি। বহু মানুষের দীর্ঘকালের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন, প্রচেষ্টা, ত্যাগ, ব্যর্থতা ও সাফল্যের মেলবন্ধন হলো আজকের এই আধুনিক উড়োজাহাজ!

উড়োজাহাজ আবিষ্কার করার গল্প শুরু করলেই স্বাভাবিকভাবে চলে আসবে রাইট ভাতৃদ্বয়ের নাম। **উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট**। এই দুই ভাই **১৯০৩ খৃস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর সফলভাবে সর্বপ্রথম তাদের নিজেদের তৈরি উড়োজাহাজে আকাশে উড়তে সক্ষম হন।**

বাবা মিল্টন রাইট তার দুই ছেলে উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইটকে একটি খেলনা হেলিকপ্টার উপহার দেন। যেটির নকশা করেছিলেন হেলিকপ্টার উদ্ভাবক ফ্রান্সের **আলফোন্স পেনাউড**। কাগজ, বাঁশ এবং একটি রাবার ব্যান্ডের সঙ্গে কর্ক বেঁধে তৈরি করা হয়েছিল সেই হেলিকপ্টার। উইলবার এবং অরভিল খেলনাটি নিয়ে মেতে ওঠেন। বহু ব্যবহারে সেটি ভেঙে গেলে দুই ভাই মিলে একটি খেলনা হেলিকপ্টার তৈরী করে ফেলেন। এরপর থেকে তারা স্বপ্ন দেখতে থাকেন হেলিক্টারে উড়ে নীল আকাশে ওড়ার। এভাবে তাদের মনোজগতে আকাশে ওড়ার বাসনা তৈরি হয়। আর এই বাসনা থেকেই দুই ভাইয়ের মনে উড়োজাহাজ বানানোর ইচ্ছা প্রবল হয়েছিল।

উইলবার রাইট ১৮৬৭-এর ১৬ এপ্রিল আমেরিকার ইন্ডিয়ানা রাজ্যের মিলভিলে এবং অরভিল রাইট ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট ওহাইও রাজ্যের ডেটনে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি দুই ভাইয়ের খুব একটা আগ্রহ ছিল না। স্কুলে ভর্তি হলেও সার্টিফিকেট গ্রহণের আগেই তারা স্কুল ত্যাগ করে। উইলবার ছিলেন ভালো অ্যাথলেট। তরুণ বয়সে আইস-স্কেটিং করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তার সামনের কয়েকটি দাঁত ভেঙে যায়। গুরুতর আহত হওয়ার কারণে তার আর বড় কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এ সময়ই তার মা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলে তিনি মায়ের সেবায় বাড়িতেই থাকেন। কিন্তু বাড়িতে থাকলে কী হবে, পড়াশোনা কিন্তু সে ঠিকই করেছে। বাবার লাইব্রেরি ছিল তার পড়ার জায়গা। অসুস্থ মায়ের সেবা করে যতটুকু সময় পেতেন ওই লাইব্রেরিতে গিয়ে বসতেন। ছোট ভাই অরভিলও পড়াশোনায় ভালো ছিলেন।

এক পর্যায়ে দুই ভাই ছাপাখানার ব্যবসা শুরু করেন। দুজনে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন, 'WEST SIDE NEWS'। নিজেদের কাগজ ছাড়াও তাদের প্রেসে আরও কয়েকটি পত্রিকা ছাপানো হতো। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে দুই ভাই

ছাপাখানার ব্যবসা বাদ দিয়ে বাই সাইকেল তৈরির কারখানা করেন। এতে তাদের অর্থনৈতিক সফলতা আসে। এবার সেই ছোট্ট বেলার আকাশে ওড়ার সুপ্ত বাসনা বাস্তবায়নের জন্য তারা মনোযোগী হন।

তবে বলে রাখা ভালো আকাশে ওড়ার স্বপ্ন শুধু এই দুই ভাইয়ের নয়, অনেকেরই ছিল। তাদের ব্যর্থতা থেকে দুই ভাই অনেক শিখেছেন।

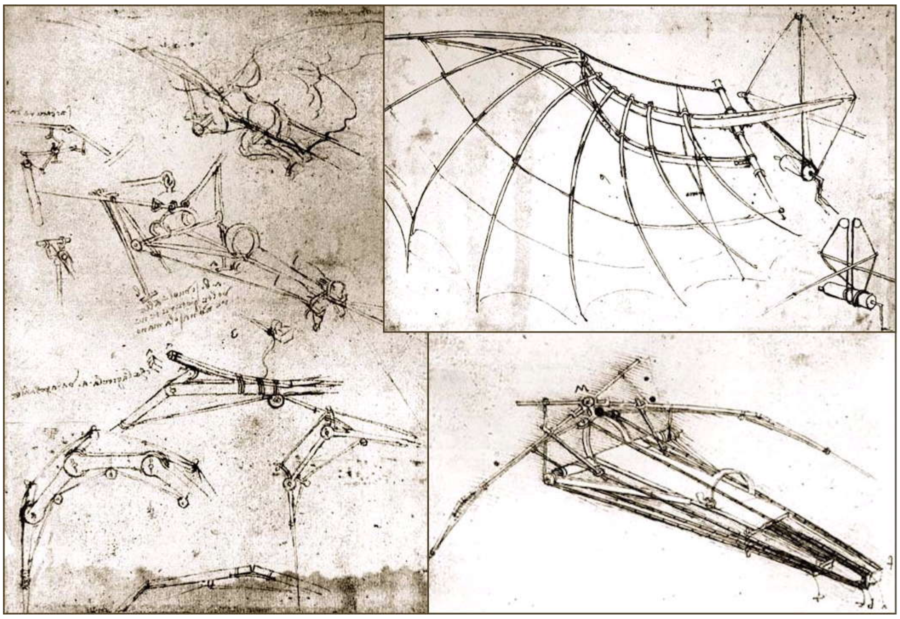

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি দ্বারা অঙ্কিত উড়োজাহাজের নকশা

মানুষের পূর্বেই পাখিদের এই পৃথিবীতে আগমন। ডানা মেলা পাখি দেখে সম্ভবত মানুষ নীল আকাশে কল্পনার ডানা মেলে দিত। নিবেদিত প্রাণ অনেকেই হাতে পায়ে পাখা লাগিয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে হাত পা নেড়ে পাখির মত উড়তে চাইল। বাতাসের সমুদ্রে ঝাপ দিল এইভাবে আরো সাহসী মানুষ। কিন্তু হায়! মৃত্যুই শুধু তাদের সকল প্রচেষ্টাকে অমর করে রাখল। মানুষের পাখা নেড়ে উড়ে বেড়ানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

এইসময় উন্নত উড্ডয়ন যন্ত্রের চিত্র অংকন করেন শিল্পী তথা বিজ্ঞানী **লিওনার্দো দা ভিঞ্চি**। তিনি সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ার একটি তাত্ত্বিক ধারণাও দেন। ভিঞ্চিকে সেই যুগের মহামানব বলা অতুক্তি হবে না, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি দিকেই তার ছিল অবাধ বিচরণ। আকাশে ওড়ার ক্ষেত্রে মানুষের একমাত্র অনুপ্রেরণা ছিলো পাখিরা। ডানা ঝাপটিয়ে পাখির উড্ডয়ন কৌশলকে কাজে লাগিয়ে মানুষও চেয়েছিলো আকাশে উড়তে। কিন্তু মানুষের বাহু ডানা ঝাপটানোর জন্য যথেষ্ট শক্তি ধারণ করে না। কাজেই ডানাকে যান্ত্রিকভাবে চালানোর জন্য অর্নিথপ্টার নামক যন্ত্রের নকশা করা হয়।

মূলত ১৫৯১ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভিঞ্চি বেশ কয়েকটি অর্নিথপ্টার যন্ত্রের নকশা তৈরী করেছিলেন। পাখির উড্ডয়ন কৌশল নিয়ে তিনি বেশ বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেছিলেন। তাঁর নোটবুকে পাখিদের উড্ডয়নের অসংখ্য স্কেচ পাওয়া যায় যেখানে তিনি দেখিয়েছেন পাখির ওড়ার সময় কোন অবস্থানে তার ডানার অবস্থা কেমন থাকে, কীভাবে সেটা আবার পাল্টে যায়। যদিও যতদূর জানা যায় যে, তাঁর নকশাকৃত কোনো যন্ত্রই বাস্তবে তৈরী হয় নি। তাঁর নকশাগুলো মৌলিক হলেও এরোডাইনামিক বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা ছিলো। যদিও তিনি সফলভাবে যন্ত্র তৈরী করতে পারেন নি। কিন্তু তার চিন্তাধারাই বহু মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মানুষের উড়তে শেখার শুরুটা ছিল মূলত উড্ডয়নের উপর ভিঞ্চির বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ থেকেই। ডানা নিয়ে এতো কিছু করেও তেমন কোনো সফলতা না পেয়ে সপ্তদশ শতকের শেষ দিক থেকে মানুষ মন দিল বেলুন নিয়ে আকাশে ওড়ার। কারণ অনেকে সেই সময় জানতো যে, উত্তপ্ত বাতাস সাধারণ বাতাসের চেয়ে হাল্কা, তাই গরম বাতাস কোনো বড় বেলুনে ভরে রাখলে সেই বেলুনটি বাতাসে ভেসে থাকতে সক্ষম। এইভাবে গরম বাতাস বেলুনে ভরে ১৭৮৩ সালে মানুষ সর্বপ্রথম আকাশে ভেসে বেড়াতে সক্ষম হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল ফ্রান্সে। মন্টগোফিয়র ভ্রাতৃদ্বয়ের আবিস্কৃত বেলুনে চড়ে জেন ফ্রান্সিস ডি রোজিয়ার এবং ফ্রান্সিস লরেন্ট ডি'আরলান্দিস নামক দুই ব্যক্তি ৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করেছিলেন। বেলুনে গরম বাতাসের উৎস হিসেবে ছিল কাঠ জ্বালিয়ে পাওয়া ধোঁয়া। ঐ বছরেই হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি বেলুন নিয়ে মানুষ আকাশ ভ্রমণ করে ফেলে।

তবে গ্লাইডার আবিষ্কার না হলে উড়োজাহাজ আবিষ্কার তখন হতে পারত কিনা সন্দেহ। গ্লাইডার হচ্ছে বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ুক্কু যান নির্মানের প্রথম ধাপ। এটি বাতাসের চেয়ে ভারী এক ধরনের ইঞ্জিনবিহীন ডানা ও লেজবিশিষ্ট উড়োজাহাজ। গ্লাইডারকে ব্যাহ্যিক শক্তির সাহায্যে একবার উড়িয়ে দিলে বা উঁচু পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়লে এটি তার নিজস্ব বড় ডানায় ভর করে অনেকক্ষণ ধরে বাতাসে ভেসে বেড়াতে সক্ষম।

এরপর ১৭৯৯ সালে **স্যার জর্জ কেইলি** প্রথম আধুনিক গ্লাইডারের মডেল উপস্থাপন করেন। এতে দিক নিয়ন্ত্রণের আলাদা লেজ ছিল। এই মডেল সর্বপ্রথম আকাশে ওড়ে ১৮০৪ সালে। এর পরের অনেক বছর তিনি আরও উন্নত গ্লাইডার আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করে যান। তিনিই সর্বপ্রথম এরোডাইনামিক্সের অনেক সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেন এবং Lift(উত্তোলন বল), Drag (রোধক বল) ইত্যাদি শব্দের সূচনা করেন। তিনি পরে তার গ্লাইডারে গান পাউডার দিয়ে চালিত ইন্টারনাল ও এক্সটারনাল ইঞ্জিন স্থাপন করেন। পরে অবশ্য এলফন্স পেনাউড নামের আরেক ব্যক্তি জ্বালানী হিসেবে রাবার পাউডার ব্যবহার করে এই ইঞ্জিনকে আরও আধুনিক করে তোলেন। ১৮৫৩ সালে জর্জ কেইলি তার আবিস্কৃত গ্লাইডার ব্যবহার করে বেশ সফলতার সাথেই ছোটখাট আকাশ ভ্রমণ করে ফেলেন।

সর্বশেষে জার্মানীর **অটোলিলিয়ানথাল** ও তার ভাই **গোস্তাভ** ঐ সময় পাখির মত পাখা মেলে উড়তে চেষ্টা করেন এবং পরে গ্লাইডারের সাহায্যে উড়তে সমর্থ হন।

এবার কয়েকজন উড়োজাহাজ ডিজাইনারের কথা বলি যারা উড্ডয়নের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৬৭০ সালে **ফ্রান্সিস কোডি লানা** নৌকার মত একটি উড়োজাহাজের নকশা এঁকেছিলেন। তার উড়োজাহাজের নকশায় নৌকার উপরে ছিল একটি পাল আর বায়ু শূন্য তাম্র নির্মিত চারটি পাতলা গোলক। অবশ্য সেটি কখনো আকাশে পাল তোলে নি। কেননা চারটি পাতলা বায়ুশূন্য তাম্র গোলক নৌকাটিকে কখনো আকাশে নিয়ে যেতে সমর্থ ছিল না। বায়ুশূন্যতার ফলে গোলকগুলি বাইরের বায়ুর চাপে ধ্বংস হতে বাধ্য হত। সুতরাং পালের ধারণাও ছিল অবাস্তব।

এইবার ফ্রান্সের এনোনে শহরের দুই ভাই **জোশেফ** এবং **এতিনে মুরগলফার** এর কথা বলা যাক। ১৭৮২ সালের কাহিনী। ওরা শুধু মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকেন, আর ভাবেন কি মজা হতো যদি না মেঘের উপর ভেসে বেড়ানো যেত। কিন্তু এটা

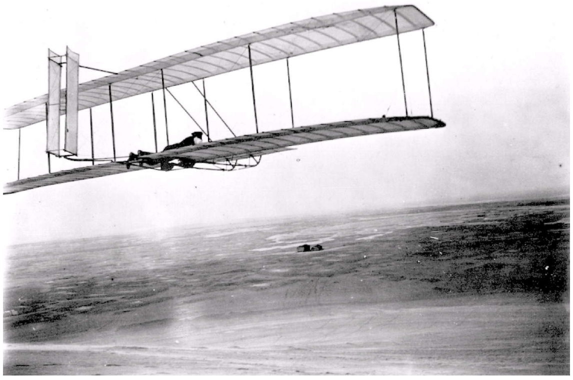

গ্লাইডারের সাহায্যে ওড়া

কেমন করে সম্ভব? মেঘতো বায়ুর চেয়ে কিছুটা হালকা জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছু নয়। এলোমেলো ভাবনা তাদের মগজে ঢেউ খেলত। ভাবতেন মেঘ যদি কোন একটি থলির ভেতর ঢোকানো যায় তবে তা তাদের আকাশে নিয়ে যেতে পারবে। আসলে মেঘের কোন প্রয়োজন ছিলনা। অবশ্য বায়ু থেকে হালকা কোন পদার্থও তাদের জানা ছিলনা। এক শীতের রাতের ঘটনা। ওরা রান্নাঘরের চুল্লির পাশে বসে লক্ষ্য করছেন কিছু ছাই আগুনের ধোঁয়ার উপর ভাসছে। ভাবলেন আকাশে উড়ার সঠিক বস্তুটি পাওয়া গেছে। আর মেঘের প্রয়োজন নেই। তারা একটি ছোট্ট রেশমের থলি খুঁজে বের করলেন। কিছুক্ষণ আগুণের উপর ধরে রাখলেন। ধোঁয়ায় ওটা পূর্ণ হয়ে গেল। এক সময় ছেড়ে দিলে সেটা ক্রমে উপরে উঠল। এখনকার দীপাবলীর ফানুসের মতো আর কি!!

চলল তাদের সাধনা। প্রথমে ছোট থলি, অতঃপর বড় থলি দ্বারা চালালেন অনেকগুলি পরীক্ষা। তারা ৩৮ ফুট পরিধির বড় একটি লিলেনের থলি বানিয়ে ফেললেন। একটি মাঠের মাঝে উড্ডয়ন পরীক্ষা করতে চাইলেন। ৫ই জুন ১৭৮৩ সাল। একটি খড়ের অগ্নিকুন্ড প্রস্তুত করা হল। দুই ভাই, আরো অনেকে থলি আগুনের উপর খুলে ধরলেন। উত্তপ্ত ধোঁয়ায় থলিটি পূর্ণ হয়ে গেল। ক্রমে সেটা ৬০০০ ফুট উর্ধ্বে উঠে গেল। অতঃপর বায়ুর গতিপথে ১০ মিনিট কাল ভ্রমণ করে দেড় মাইল দূরে ভূমিতে নেমে এল। এরূপে **আবিস্কৃত হল প্রাথমিক আকাশযান**। হাজার বছর পূর্বে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা পাখির ডানায় শুনেছিলেন ভবিষ্যত আকাশযানের যে আগমনবার্তা, বেলুন ও গ্লাইডার আবিষ্কার মানুষকে নিয়ে গেল সে স্বপ্নের খুবই কাছে।

উড্ডয়নের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়ার**লরেন্স হারগ্রের** অবদানও খাটো করে দেখলে চলবে না। তিনি এমন একটি বাক্স ঘুড়ি আবিষ্কার করলেন যাতে গ্লাইডার এবং উড়োজাহাজে ব্যবহার যোগ্য বিশেষ ধরনের পাখা সংযুক্ত করা সম্ভব। ইংল্যান্ডের **হুরাশিও ফিলিপস** তার গবেষণা দ্বারা বিমানের পাখার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। তার বানানো একটি আকাশযানের উড্ডয়ন পরীক্ষা **১৮৯৩** সালে করা হয়েছিল। তাতে ছিল ৫০টি পাখা। সেটাতে সংযুক্ত করা হয়েছিল ষ্টিম ইঞ্জিন। যানটির শুধু পেছনের চাকা ভূমি হতে উপরে অল্প উঠেছিল। **স্যার হিরাম ম্যাক্সিম ১৮৯৪** সালে চার টন ওজনের এক আশ্চর্য আকাশযান তৈরী করেন। তিনি ছিলেন লন্ডনে বসবাসরত একজন প্রবাসী আমেরিকান। তিনি সেটিকে রেললাইনের উপর থেকে উড্ডয়ন করাতে চেয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে সেটি **১৮০** হর্স পাওয়ারের দু'টি স্টিম ইঞ্জিনের সাহায্যে রেলপথের উপর দিয়ে ছুটে গেল। চাকা পথ থেকে সামান্য উপরে উঠল অতঃপর ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল। **১৮৯৭** সালে ফ্রান্স দেশের **ক্লিমেন্ট আড়ের** এভিয়ন থ্রী নামে একটি আকাশযান তৈরী করেছিলেন। তিনি দাবী করেছিলেন, ষ্টিম ইঞ্জিনচালিত এই যানটি আকাশে উড্ডয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

অটোলিলিয়ানথাল অনেক গ্লাইডার তৈরী করেছিলেন। দুই হাজার বারের অধিকবার তিনি সেগুলোর সাহায্যে উড্ডয়ন করেছিলেন। **১৮৯৬** সালে তিনি তার তৈরী একটি গ্লাইডারে আড়াই অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটি মোটর সংযোজন করেন। সেটার জ্বালানী ছিল **ঘনিভূত কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস।** ৯ই আগস্ট তার যান্ত্রিক যানে তিনি সওয়ারী হলেন। দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হলেন। তার শেষ উচ্চারণ ছিল "অবশ্যই আত্মত্যাগ করতে হবে"। পরে জার্মান অটোলিলিয়ানথালের একজন ইংরেজ ছাত্র **পার্সি পিলচার** একই উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনচালিত গ্লাইডার চালাতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। তার অপর একজন ছাত্র ছিল **অকটেভ চেনুট**। তিনি একপাখা এবং দুই পাখাবিশিষ্ট বহু গ্লাইডার নির্মাণ করেন। ঐগুলিতে তিনি ও তার ছাত্র **এ এম হেরিং** প্রায় ৭০০ বার উড্ডয়ন করেন।

'ব্যর্থতাই সফলতার ভিত্তি' প্রবাদটি উড়োজাহাজ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে চরম সত্য। উপরে আলোচিত কোনো প্রচেষ্টা সফল হয় নি তা সত্য, তবে ওগুলো সে অর্থে ব্যর্থও হয় নি। কেননা ব্যর্থ প্রচেষ্টার পথ ধরেই **উইলবার রাইট** এবং **অরভিল রাইট** নামে দুই ভাই **১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সফলভাবে সর্বপ্রথম আকাশে উড্ডয়ন করতে সমর্থ হন।**

এ জন্য দুই ভাই সংগ্রহ করেন **স্যার জর্জ কেইলি, চেনুট, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, ল্যাংলির** ও অন্যান্যদের এরোনেটিক সংক্রান্ত গবেষণার তথ্যাদি। **১৮৯৬** এবং **১৮৯৮** খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বিমান তৈরির ওপর যত প্রকাশনা রয়েছে সেগুলো তারা সংগ্রহ করে মনোযোগ দিয়ে পড়েন। তাদের দেখানো পথ ধরেই এবার রাইট ভাতৃদ্বয় শুরু করেন ক্লান্তিহীন গবেষণা। শুরু হল তাঁদের অফুরন্ত প্রচেষ্টা।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে উইলবার পাঁচ ফুট উচ্চতার একটি বাক্স ঘুড়িতে পাখা বেঁধে ওড়ার চেষ্টা করেন। পরের বছরই তারা গ্লাইডার তৈরি করেন। এটিকে ওড়ানোর জন্য আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনার কিটি হকে নিয়ে আসা হয়। উড্ডয়নটি মাত্র **১২** সেকেন্ড স্থায়ী ছিল। তাতে অবশ্য তারা দমে যাননি। এরপর **১৯০১** এবং **১৯০২** খ্রিস্টাব্দে পরপর দুটি পরীক্ষা করেন।

প্রতিটি নকশার বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে তাঁরা বুঝতে পারলেন **শুধুমাত্র বাতাসের গতিবেগে একে বেশিদূর চালনা করা যাবে না, প্রয়োজন শক্তিচালিত ইঞ্জিনের** যা একমাত্র পারবে উড়ন্ত যানকে গতি দিতে। কিন্তু কেমন হবে সেই ইঞ্জিন, তার প্রকৃতি কিছুতেই নির্ধারণ করতে পারেন না দুই ভাই। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই থাকলো। প্রতিবারেই সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক এক সময় হতাশায় ভেঙে পড়েন দুজনে। আবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কিছুদিন পর তাঁরা বুঝতে পারলেন এইভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। এজন্যে প্রয়োজন আরো জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। আর পরিপূর্ণ জ্ঞান না হলে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন অসম্ভব।

শুরু হলো ব্যাপক অধ্যয়ন আর অধ্যবসায়। দুই ভাইয়ের মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল স্বপ্ন – এমন যন্ত্র তৈরি করতে হবে যাবে মানুষ শূন্য আকাশে ভেসে যাবে। আর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে দুই ভাই ছোট একটি কারখানা তৈরি করলেন। দীর্ঘ এক বছরের সাধনায় তৈরি হল এক বিশাল গ্লাইডার বা উড়ন্ত যান। এতদিন যে ধরনের গ্লাইডার তৈরি হত এটি তার চেয়ে একেবারে স্বতন্ত্র। এই গ্লাইডার বাতাসে ভারসাম্য রেখে সহজেই উড়তে সক্ষম হবে।

গ্লাইডারের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দুই ভাই তৈরি করলেন দুই পাখাবিশিষ্ট ছোট বিমান। এ বিমানের সামনে ও পেছনের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা ছোট যন্ত্র সংযোজন করা হলো। এর নাম এলিভেটর। মূলত এই এলিভেটরের সাহায্যে পাইলট কোন বিমানকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। এবার নির্মাণ কাজ সমাপ্তের পর শহর থেকে দূরে এক নির্জনে দুই পাখাওয়ালা

বিমানকে শূন্যে ভাসিয়ে দিলেন। বেশ কয়েকবার বিমানকে আকাশে ওড়াবার পর দুই ভাই বুঝতে পারলেন এখনো তাঁদের উদ্ভাবিত বিমানে কলাকৌশলের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

দুই ভাই আবার শুরু করলেন তাঁদের কর্মতৎপরতা। এবার তাঁদের মূল লক্ষ্য কিভাবে গ্লাইডারকে শক্তিচালিত করা যায়। বিভিন্ন ইঞ্জিন দিয়ে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল একমাত্র **পেট্রোল চালিত ছোট** ইঞ্জিনই বিমান চালানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে। প্রতি তিন পাউন্ড ওজনের জন্য এক অশ্বশক্তি সম্পন্ন ইঞ্জিন প্রয়োজন। আর বাজারে যে সমস্ত ইঞ্জিন পাওয়া যায় তার প্রতিটিই গাড়ির ব্যবহারের জন্য, বিমান ব্যবহারের অনুপযুক্ত। এজন্য অরভিল এবং উইলবার রাইট ইঞ্জিন তৈরির কাজে হাত দিলেন। কয়েক মাসের চেষ্টায় তৈরি হল বিমানে ব্যবহারের উপযুক্ত ইঞ্জিন।

অবশেষে প্রত্যাশিত সেই দিনটি এলো **১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ সাল**। শীতের কনকনে দিন। অরভিল এবং উইলবার রাইট তাঁদের তৈরি বিমান নিয়ে এলেন কিটিহক শহরেরপ্রান্তে। এই প্রথমবারের মতো পৃথিবীর মানুষ বিমানে চেপে মহাশূন্যে পাখির মত ভেসে বেড়াবে এ সংবাদ আগেই শহরময় প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু কেউই একথা বিশ্বাস করতে পারল না।

আকাশে উড়বে বিমান। সমস্ত যন্ত্রপাতি শেষবারের মত পরীক্ষা সমাপ্ত করলেন দুই ভাই, নিশ্চিত হলেন তাঁদের তৈরি প্রথম এরোপ্লেন ওড়াবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। এরোপ্লেন কথাটা সেসময় সৃষ্টি হয়নি। নাম দেয়া হয়েছিল**রাইট ফ্লাইয়ার**।

মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। অরভিল বিমানের প্রপেলার চালু করলেন। উইলবার বিমানের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে দিলেন। তারপর সমস্ত শক্তি দিয়ে উড়ন্ত যানকে ঠেলতে শুরু করলেন। তাদের ঘিরে থাকা লোকগুলো সবাই অবাক হয়ে গেল। তাদের অবাক দৃষ্টির সামনে দিয়েই সামান্য দূর গিয়েই বাতাসের বুক চিরে শূন্যে উড়ে চলল প্রথম বিমান। কিছুদূর গিয়ে একবার পাক খেল। বেশকিছুক্ষণ এই বিমান চলতে থাকলো। তারপর ধীরে ধীরে মাটিতে নেমে এল। প্রায় বারো সেকেন্ড আকাশে ভেসেছিল রাইট ভাইদের প্রথম এরোপ্লেন। এই বিমান যাত্রাই নতুন যুগের সূচনা করল, যে যুগ গতির যুগ, সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ছোটার যুগ!!

তারা তাদের দুই পাখা বিশিষ্ট চার সিলেন্ডারের পেট্রোল ইঞ্জিনে বিমানে সেদিন সফলভাবে চারবার আকাশে উড্ডয়ন করতে সমর্থ হন। প্রথমবার তারা ১২ সেকেন্ডে ১২০ ফিট উড্ডয়ন করেছিলেন। দ্বিতীয়বার উড্ডয়ন করতে সমর্থ হন **১১** সেকেন্ডে **১৯৫** ফিট। অতপর তৃতীয়বার উড়েন **১৫** সেকেন্ডে ২০০ ফিট এবং শেষবার উড্ডয়ন করেন ৫৯ সেকেন্ডে ৮৫২ ফিট। এরপর তারা সাধনা অব্যাহত রেখে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করেন Flyer-111. এবং এটিতে তারা ১০৫ বার উড্ডয়ন করেন। এ ঘটনা পৃথিবীর সকল গণমাধ্যম বিশেষ করে আমেরিকার বিখ্যাত 'হেরল্ড ট্রিবিউন' পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

[**পুনশ্চ ঃ** বড় উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ে কিভাবে?

যে কোন বস্তুর চারদিকে বাতাসের চাপ সব সময় সমান। কিন্তু তাকে শূন্যে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পড়ে যায় বস্তুর ওজন (Weight) ও পৃথিবীর অভিকর্ষজনিত বলের কারণে। সুতরাং এমন একটা শক্তির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বস্তু **ওজন** (Weight)**+ অভিকর্ষজনিত** বলকে মোকাবিলা করে বাতাসে ভেসে থাকা যায়। যেহেতু চারিদিকে বাতাসের চাপ সমান তাই ওজন+অভিকর্ষজনিত শক্তি'র বিপরীত দিকে বাতাসের চাপ কমালেই নীচ থেকে বাতাসে ঐ বস্তুকে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে। এই শক্তির নামই lift।

সুতরাং যে কোন ভাবে হোক বস্তু উপরের অংশের বাতাসে চাপ কমালেই ভেসে থাকা সম্ভব। কিন্তু তা হয় কিভাবে?

Bernoulli principle অনুসারে বলা যায় যে কোন প্রবাহিত স্রোতের (জল/ফ্লুইড/বাতাস) কোন জায়গায় গতি বেশি হলে সেখানে (বাতাসের) চাপ কমে যায়।

প্লেনের বিশাল ডানা দুটির কথা ভাবুন। ডানার নিচের অংশ সমান হলেও উপরটা একটু ওভাল শেপ (Aerofoil) ডানা'র নিচে বাতাস সোজা ভাবে গেলেও উপর দিকে একটু বেঁকে যাচ্ছে। তাতে বাতাসে গতিও বেড়ে যাবে। Bernoulli principle অনুযায়ী সেখানে বাতাসের চাপ কম থাকবে।

তাহলে ডানা'র নিচের দিকের বাতাসের উচ্চচাপ প্লেনের ওজন (Weight)+ অভিকর্ষ শক্তিকে বাতিল করে তাকে শূন্যে ভেসে থাকতে সাহায্য করবে।

আর ইঞ্জিনের কাজ হল Thrust এর মাধ্যমে প্লেনকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যেন ডানা'র উপর এমন বাতাসে প্রবাহ এত বেশি হয় যাতে প্লেনের ওজনকে বাতিল করার মত Lift তৈরি করতে পারে।

প্রপেলার বা জেট ইঞ্জিন দিয়ে Thrust উৎপন্ন করা যায়।]■

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

হরি রাম আহমেদ

কেন এই লেখা

আমাদের বাংলাভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের একটা গল্প দিয়ে শুরু করলাম। গল্পের নাম ব্যাঙের সমুদ্র দেখা (জাপানী গল্প)।

গ্রামের ধারে কবেকার পুরান এক পাতকুয়োর ফাটলের মধ্যে কোলাব্যাঙ তার পরিবার নিয়ে থাকত। সেখানে জল নিতে আসতো গ্রামের মেয়েরা, এছাড়া আসতো আরো অনেক মানুষ, কুকুর ইত্যাদি। কোলাব্যাঙের ছেলেমেয়েরা ভাবতো তাদের বাবা কত কিনা জানে। কোলাব্যাঙ জল নিতে আসা বা জল খেতে আসা সকলের কথাবার্তা থেকে যা শুনতো, তাই তার বউ-বাচ্চাদের বলতো। ছেলেরা ভাবত 'ইস! বাবা কত জানে!' একদিন জল নিতে আসা মেয়েরা সমুদ্র নিয়ে আলোচনা করছিল। তাই শুনে ছেলেরা বাবাকে জিজ্ঞাসা করল – "হ্যাঁ বাবা! সমুদ্র কাকে বলে?" উত্তরে কোলাব্যাঙ বলল যে সেটা একটা জন্তু। কারণ সে বিভিন্ন জন্তু ছাড়া আর কিবা দেখেছে। উত্তরে ছেলেরা বলল – "ওরা যে বলছিল সমুদ্র খুব ভয়ানক বড় হয়। আর তার মধ্যে অনেক জল থাকে – আর লোকেরা সাঁতার কেটে তা পার হতে পারে না।"

সকালে ঘুম থেকে উঠে কোলাব্যাঙ সকলের আপত্তি সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়ল সমুদ্রের সন্ধানে। পথে সঙ্গী হিসেবে পেল মাঠের এক মেটে ব্যাঙকে। সেও চলেছে সমুদ্রের সন্ধানে।

সমুদ্রে যাবার পথ তো তারা জানে না। বেশ কিছুটা গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা মস্ত ঢিপি পেল, মেটে ব্যাঙের পরামর্শে তারা অনেক কষ্টে তার উপরে উঠে যা দেখলো তা তারা আগে ঢের দেখেছে। নতুন কিছু নয়। আশাহত হয়ে ফিরে এসে কোলাব্যাঙ তার ছানাদের বিরক্ত হয়ে বলল "সমুদ্র টমুদ্র কিছু নেই – ওসব মিছে কথা।"

কূপমন্ডুক কথার অর্থ কুয়োর মধ্যে ব্যাঙ। মানুষ নামের প্রাণী কিন্তু চিরকাল কূপমন্ডুক হয়ে থাকলে আজকের সভ্যতা এখানে এসে পৌঁছেতো না। মানুষ এই পৃথিবীতে আসার সাথে সাথে অন্যান্য প্রাণীদের মতোই প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, অন্য জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করেছে একজোট হয়ে। এই সময় থেকে মানব মনে প্রকৃতিকে জানার কৌতূহল জন্মায়। তার ধারাবাহিকতা আজও অবিরত।

মানুষের এই জানার পরিধির বিস্তার এখন বহুযোজন প্রসারিত হয়েছে। ব্যাঙ যেমন সমুদ্রের সন্ধানে বেরিয়েছিল তেমন মানুষ দূর থেকে দূরে গেছে। কিন্তু মাঝপথে অজানার সন্ধান বিরত রেখে ফিরে আসে নি। তার জ্ঞান সমুদ্রের অনুসন্ধান চলছে। মানুষের এই অন্বেষণের একটা ধারাবাহিক বিবরণে এবার যাওয়া যাক।

প্রথম পর্ব

এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও জীবজগৎ (প্রাণী থেকে উদ্ভিদ সহ অন্যান্য) আছে কিনা আমরা জানি না। কিন্তু বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তৈরী হয়েছে, তাতে এই পৃথিবী ছাড়াও অন্য গ্রহে কিংবা উপগ্রহে জীবজগতের অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা ভাবা যায়।

'জীবনের আর এক নাম জল' – এই ধারণা আমাদের অনেক দিনের। তাইতো মঙ্গলগ্রহে জল আছে কিনা, তা জানার জন্য আমাদের এত উৎসাহ। আমরা জানি আমাদের এই পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদে জলের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

প্রাণীজগতে একমাত্র মানুষেরই মনে নানা প্রশ্ন। এমন প্রশ্ন জীবকূলে আরো কারোর আছে কিনা তা আমরা এখনো জানি না। তবে যুক্তি বলে, একমাত্র মানুষ নামক প্রাণী প্রকৃতির নিয়ম জানার বিষয় আগ্রহী। কোনো কিছু অজানা থাক, এটা তাদের কিছুতেই স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। আমাদের এই পৃথিবী কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটা দেখতে কেমন? অভিজ্ঞতা থেকে তার উপরিতলে থাকা বস্তুগুলির সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু মাথার উপর নীল আবরণ – ঐ আকাশটা কেমন? সেখানে রাতের অন্ধকারে কত তারা, আর চাঁদ দেখা যায়। পূর্ব আকাশে সূর্যের আলো ফুটলে দিন শুরু হয়, আবার দিগন্ত রেখার নীচে সে ডুব দিয়ে পশ্চিমে অস্ত যায়। রাত আসে ঘনিয়ে। একদিকে ভয় আর অন্যদিকে মানুষের বিস্ময় জেঁকে বসে। এমন সময়ই নানান প্রশ্ন মানুষের মাথায় এসেছিল। তখনই সব প্রাকৃতিক ভাবে ঘটে চলা কাজগুলির সামর্থ যোগায় যে সর্বশক্তিমান সেই ঐশ্বরের খোঁজ চালু হল।

তাপ প্রবাহ, প্রচন্ড ঝড়, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে মানুষ যখন লড়াই করছে বেঁচে থাকার জন্য – তখন এসব কিছু কে বানালো? কার আঙুলের ইসারায় এসব হয়ে চলেছে? এই সকল প্রশ্ন মনে রেখাপাত করেছে। রাজত্ব ছাড়া যেমন রাজা অর্থহীন, তেমনি ঈশ্বরের সৃষ্টি করা জগৎসংসার ছাড়া ঈশ্বরও

অর্থহীন। এই কারণেই এই জগৎ কী দিয়ে গড়া তা মানব মনে বারংবার এসেছে।

আজকের মানুষের পূর্বপুরুষরা শুরুতে গাছে বাস করতো (আনুমানিক ৫০ লক্ষ বছর আগে)। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বৃক্ষবাসী মানুষ থেকে নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ানো মানুষের রূপে আসতে সময় লেগেছে আরো বহু বছর। আফ্রিকার তাঞ্জানিয়ায় পাওয়া আধা-মানুষের জীবাশ্ম থেকে বলা হয় আট থেকে দশলক্ষ বছর আগে এই ধরনের মানুষের অস্তিত্ব ছিল। খাড়া মানুষ জীবন ধারণের জন্য দলবদ্ধভাবে জীবজন্তু শিকার করতো। এই সময়ই মানুষ তার অদক্ষ হাতে পাথরের অস্ত্র তৈরী করেছিল।

ছয় থেকে সাত লক্ষ বছর আগে বরফ যুগ এসেছিল। এই বরফ যুগ প্রাকৃতিক নিয়মেই ফিরে ফিরে আসে। এই সময় মানুষ উত্তর আফ্রিকা থেকে ছড়িয়ে পরেছিল ইউরোপ ও এশিয়ায়। খাড়া মানুষ যৌথ উদ্যোগে ভাষা আবিষ্কার করল, আগুনের ব্যবহার শিখলো, ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠলো তারা বুদ্ধিমান মানুষ, যাকে বলা হয় হোমো সেপিয়ান (আজ থেকে ১০-১৫ লক্ষ বছর আগে)।

বরফ যুগের অবসানের পর আমেরিকা মহাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এরফলে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষ অবশিষ্ট মানব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। বিচ্ছিন্নতার কারণে, অসম বিকাশের ফলে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার মানুষ শিকারী যুগেই আটকে ছিল। আমরা শিশুপাঠ্য একটি রূপকথার গল্পের বই 'সারা বিশ্বের সেরা রূপকথা' (প্রথম খন্ড) [অনুবাদ ও সম্পাদনা অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী ও শাশ্বতী রায়চৌধুরী] থেকে অস্ট্রেলিয়ার রূপকথা 'পাথরের ব্যাঙের দুঃখের গল্প' পড়লে অস্ট্রেলিয়ার শিকারী মানুষের অবশেষ সম্পর্কে জানতে পারি। এই গল্পে একজন যাদুকরের চরিত্র আমরা পাই, যার পিঠে ছিল এক প্রকান্ড কুঁজ। তাকে দেখে অস্ট্রেলিয়ার এক গ্রামের চারটি মেয়ে (যারা ছিল চার বোন) মস্করা করে বলেছিল – "ইস্ দেখো, দেখো তোমার পিঠে কত বড় কুঁজ!" ওরা আরো বললো "দেখো, দেখো, তোমাকে ঠিক এমু পাখির মতো দেখাচ্ছে! বিশাল বড়, বোকা এমু পাখির মত তুমি থপ্ থপ্ করে হাঁট।" বৃদ্ধ লোকটা (যাদুকর) এবার রাগে ফেটে পড়ল, বলল – 'তেমাদের সাহস তো কম নয়। পবিত্র এমু পাখির সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলছ! জানো না এমু আমাদের উপজাতির দেবতা?"

গল্পে বৃদ্ধ যাদুকর চার বোনকে যাদুবিদ্যায় ব্যাঙে পরিণত করে দিয়েছিল। এই গল্প মানবজাতির শিকারী সমাজের অবশেষের। আমরা গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমোদের জানি, আন্দামানের জারোয়াদের সম্পর্কে শুনে থাকি। আজকের বিকশিত মানব সমাজে এরা ফসিল হয়ে রয়ে গেছে বহুদিন। নৃতাত্ত্বিক মর্গান বহুদিন আমেরিকার উপজাতিদের সাথে একাত্ম হয়ে বহু অজানা তথ্য আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন।

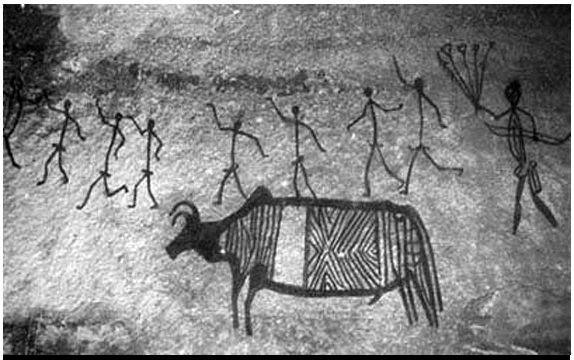

প্রস্তর যুগের শিকারী মানুষ

পুরানো প্রস্তর যুগের শেষ দিকে শিকারী মানুষরা যে দলে সংগঠিত হত তার নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্ল্যান'। অপরিচিত বা অসম্পর্কিত মানুষদের নিয়ে ক্ল্যান গঠিত হত না। গঠিত হত মাতৃতান্ত্রিক রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে। অনেকগুলো ক্ল্যান নিয়ে বৃহত্তর সংগঠনের নাম ট্রাইব। পশু সমাজের বহুগামীতার মতো ক্ল্যান ছিল মায়ের পরিচয়ে চিহ্নিত। বৃহত্তর সংগঠন ট্রাইবের প্রয়োজনীতা এসেছে অনেকে মিলে পশু শিকারের প্রয়োজন থেকে। বন্য সমাজে উৎপাদন ছিল না। ছিল শুধু প্রাকৃতিক সম্পদস্বরূপ গাছপালা, ফলমূল আর বন্যপশু হত্যার মাধ্যমে গ্রাসাচ্ছাদন। 'মানুষের ইতিহাস' (প্রাচীন যুগ) নামক গ্রন্থে এই সময়কার সমাজের একটা বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

('মানুষের ইতিহাস' – আবদুল হলিম ও নূর নাহার বেগম, পৃষ্ঠা-৬৪)

এই হিসাব অনুযায়ী – মানুষ শুধুমাত্র শিকারের উপর নির্ভর করলে অবস্থা অনুযায়ী মাথা পিছু ৭ থেকে ৫০০ বর্গমাইল জমি লাগে। অর্থাৎ যদি শিকার সুলভ হয় তবে ৭০০ বর্গমাইল জায়গায় ১০০ জন মানুষ শিকার করে খেয়ে বাঁচতে পারবে। আর যদি আবহাওয়া প্রতিকূল হয় ও শিকার দুর্লভ হয়, তবে ১০০ জন মানুষের সারা বছরের খাদ্য সরবরাহ করতে লাগে ৫০ হাজার বর্গমাইল এলাকার পশু ও প্রাণী। পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ৫ কোটি বর্গমাইল। মাথাপিছু কম করে ৭ বর্গমাইল জমি ধরলেও শিকারী যুগে সারা পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা ৭০ লক্ষের বেশি কোনোক্রমেই হতে পারত না।

আমরা যদি আজকের পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার পরিমাণটার সাথে এই হিসাবকে তুলনা করি তবে সংকটটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। (আজকের পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৭৭০ কোটি)। (তথ্য সূত্র – ওয়ার্ল্ড মিটার, www. world meters.info)

মানুষের প্রথম সৃষ্টি পাথরের হাতিয়ার দিয়ে শুরু। তারপর একে একে পশুপালন, কৃষিকাজ শেখা এই মহাসংকট থেকে মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু এই অবস্থায় আসার আগে মধ্যবর্তী স্তরে মানুষ

তারই প্রয়োজনে এক একটা গোষ্ঠী এক একটা পশু কিংবা পাখি শিকার নিজেরাই নিষিদ্ধ করলো। এক গোষ্ঠীর দ্বারা নিষিদ্ধ প্রাণীকে অন্য গোষ্ঠী শিকার করতো। কিন্তু সেই গোষ্ঠী আবার অন্য একটি নির্দিষ্ট জীব হত্যা করতো না। যে প্রাণীকে এক একটা গোষ্ঠী হত্যা করতো না, সেই প্রাণীকেই তারা পুতুলরূপে আরাধনা করতো। একেই বলা হয় **টোটেম**। আর এই এক একটা গোষ্ঠীর হত্যা নিষিদ্ধ করণের সংবিধানকে বলা হত **টাবু**। এখনো পিছিয়ে থাকা মানুষের সমাজে কালের বিবর্তনের সাথে সাথে ফসিলের মতো টোটেম ও টাবুর নমুনা পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ার রূপকথার গল্পে যাদুকর এমনই এক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি যাদের আরাধ্য টোটেম হল 'এমু পাখি'। তাই আরাধ্য দেবতার অবমাননাকে সে সহ্য করতে পারে নি।

মানুষ উৎপাদন করতে শিখে পশু জীবন ত্যাগ করলো। উৎপাদন শেখায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম হল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হল সমাজের সবথেকে যোগ্য ও শক্তিশালী ব্যক্তিরা। এদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সমস্যার সমাধান হল বহুগামী মাতৃতান্ত্রিক পশু সমাজের স্থলে একগামী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। যেখানে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি (প্রধানত জমি, আর গবাদি পশু ও মানুষ) বংশ পরম্পরায় পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত থাকে মুষ্টিমেয়র হাতে। এদের বলা হল দাস মালিক আর এদের অধীন বাকি মানুষরা সবাই দাস। মানুষের এই সমাজকে বলে দাস সমাজ ব্যবস্থা।

পশুসমাজ থেকে মুক্তি পেলেও সমাজের অধিকাংশ মানুষ দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হল। এই সময়ই নগরগুলো গড়ে উঠেছিল। নীলনদের তীরবর্তী মিশরের সভ্যতা, সিন্ধু নদীর তীরবর্তী সিন্ধু সভ্যতা ইত্যাদি হল এই যুগের নিদর্শন।

দাস সমাজে দাসমালিকের অধীন দাসেরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ তাদের কোনো অধিকার ছিল না। এরা গবাদি পশুর মতোই মালিকের অধীনে বেঁচে থাকতো বাঁচার শর্তে। যুদ্ধে পরাজিত দাসমালিক ও তাঁর সমস্ত সম্পত্তি হত বিজিতের মালিকানাধীন। পরাজিত দাসেদের শিরচ্ছেদনের থেকে মানবিক ছিল তাদের 'দাস' করে বাঁচিয়ে রাখা। তাই এই সমাজ টিকে ছিল। অথচ সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ যেহেতু ছিল সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত, তাই তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা – সৃষ্টিশীল মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নি। কেবলমাত্র নগরগুলোতে এক ধরনের স্বাধীন নাগরিকের জন্ম হয়। এদের মধ্য থেকেই দার্শনিকদের জন্ম হয়। এদের মনে জগৎ সম্পর্কে নানারকম প্রশ্ন ছিল। জগৎ সংসারটা কিভাবে চলছে? কে তার পরিচালক – এসব নানান ভাবনার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এরই পরিণতিতে জগৎ সম্পর্কে নতুন দার্শনিক ধারণার জন্ম হল।

অনেকদিন পর্যন্ত পৃথিবীটা একটা চ্যাপটা থালার মতো এমন ধারণা ছিল। এই ধারণা পাল্টালো ৩৪০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের পৃথিবী সম্পকে ধারণা থেকে। তিনি 'অন দ্য হেভেনস্' ['স্বর্গ সম্পর্কে'] নামক গ্রন্থে বললেন পৃথিবী একটা বৃত্তাকার গোলক। তাঁর এমন ধারণা হয়েছিল দুটি কারণে। এক তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, চন্দ্রগ্রহণের কারণ সূর্য আর চাঁদের মাঝখানে পৃথিবীর আগমন। চাঁদের উপর পৃথিবীর ছায়া সব সময়ই গোলাকৃতির। এখান থেকেই পৃথিবীর গোলাকার ধারণার শুরু। পৃথিবী চ্যাপ্টা থালার মতো হলে ছায়াটি হত লম্বাকৃতির উপবৃত্তাকার।

টোটেম

দাস বিদ্রোহের নেতা স্পার্টাকাস

গ্রীকরা বাণিজ্যের স্বার্থে দেশ-দেশান্তরে যেত। মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব রেখা হয়ে আরো অনেক দূর পর্যন্ত ছিল তাদের যাত্রাপথ। সমুদ্রে দিগন্তরেখার পরে জাহাজের মাস্তুলটুকুই দেখা যেতে যেতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যেত। অ্যারিস্টটল দেখলেন উত্তর মেরুর ঠিক উপরে ধ্রুবতারা (North Star)-র অবস্থান। যত বিষুব রেখার দিকে যাওয়া যায়, তারার অবস্থান নিচে নামতে থাকে, এক সময় সে এসে দাঁড়ায় দিকচক্রবালে। এইভাবে তিনি বুঝতে পারলেন যে পৃথিবীটা গোলক সদৃশ।

আমরা আসলে ঠিক কেমন দেখতে, সেটা আয়নায় নিজেদের প্রতিবিম্ব দেখে বুঝি। পৃথিবীতে বসে পৃথিবীর নিজের রূপটা চেনা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। অ্যারিস্টটলের মতো দার্শনিকের হাত ধরে পৃথিবীবাসী মানুষ তার পায়ের তলার জমি আসলে কেমন দেখতে তা চিনতে শিখলো। পাহাড়-পর্বত-সমতলভূমি দেখে এতকাল এর চেহারাটার সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল। মাথার উপর

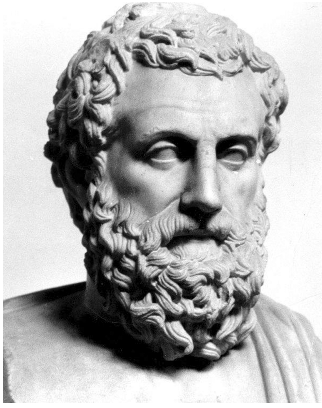

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল

আকাশটা কেমন সে সম্পর্কেও এক এক জায়গায় মানুষের এক এক ধারণা ছিল।

প্রাচীন মিশরের লোকেরা আকাশকে দেবী 'নাট' বলে মনে করতো। আর সব তারাগুলি তার গায়ে যেন পেরেক দিয়ে লাগানো আছে। সূর্য, চাঁদ, গ্রহগুলো তাঁর দেহের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। অর্থাৎ মিশরের নীলনদের তীরে বসবাসকারী মানুষরা তাদের অজানা জগৎকে দেবীর মর্যাদা দিত।

গ্রীস দেশের মানুষরা ভাবতো ছাদের মতো আকাশের গায়ে গ্রহ-নক্ষত্রগুলো পেড়েক দিয়ে টাঙানো।

প্রাচীন ভারতীয়রা বিশ্বাস করতো, বাসুকী নামের একটা সাপের কোলে কচ্ছপ বা কুর্ম অবতাররূপী ভগবান বিষ্ণু বসে আছেন। তাঁর পিঠে অনেকগুলো হাতি আর তার উপর অনেকগুলো সোনার থালা। সেই থালার উপর রয়েছে পৃথিবী, এই বাসুকী নাগের নড়া-চড়া-র ফলেই পৃথিবীতে নাকি ভূমিকম্প হয়!

আজকের দিনে অনেকের কাছেই এই ভাবনাগুলো পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু সেই সময় এই ভাবনাগুলোই ছিল স্বাভাবিক। বরঞ্চ দার্শনিকদের সে যুগে লুনাটিক (আজকের যুগে যার অর্থ পাগল) বলা হত। চাঁদের আলোয় একত্রে জড়ো হয়ে কি যে ভাবে আর আলোচনা করে, বেশিরভাগ মানুষের তা বোধোগম্যই হত না। যাই হোক এমন অবস্থায় অ্যারিস্টটলের পৃথিবীর আকার সম্পর্কে ধারণা নতুন ব্যাপার হল। এটা সম্ভব হল মানুষের সমাজের বিকাশের কারণে। মানুষের সমাজের বিকাশের কারণ তার উৎপাদনের বিকাশ। শিকারী অনুৎপাদক সমাজ উৎপাদন করতে শিখেছে, তার ক্রমান্বয় উন্নতি হয়ে চলেছে। উৎপাদনের বিকাশের সাথে সাথে ক্ষুদ্র গন্ডিতে আবদ্ধ মানুষ বহুদূর ছড়িয়ে পড়লো। বরফ যুগের আধামানুষের খাদ্যের সন্ধানে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার সাথে এর এক গুণগত তফাৎ দেখা গেল। এই যুগে ভালভ্, গিয়ার, স্প্রিং, স্ক্রু, নানারকম ওষুধ আবিস্কৃত হয়। স্থাপত্যবিদ্যা (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) এর বিকাশ এসময়ই হয়েছে। কথ্যভাষা থেকে লিখিত ভাষা এসেছে। ফলে বর্ণমালা তৈরী হয়েছে। কাগজের আবিষ্কার এই কথ্যভাষাকে লিখিত আকারে ধরে রাখতে শিখিয়েছে। আবার এই যুগেই আমরা পেয়েছি গ্রিসদেশের হেরাক্লিটাসকে (খ্রীঃ পূর্ব ৫৩৫-৪১৫); সক্রেটিসকে (খ্রীঃ পূর্ব ৪৬৯-৩৯৯) এবং প্লেটোকে (খ্রীঃ পূর্ব ৪২৮-৩৪৭)। এরা সকলেই ছিলেন যুক্তির শাসনের পক্ষে (যা যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাই হওয়া উচিৎ এবং তাই হবে) অর্থাৎ যুক্তিবাদী দার্শনিক। ইউক্লিডের জ্যামিতিও দাসযুগের আবিষ্কার। এই জ্যামিতি দর্শনের ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলেছিল। যদিও এই জ্যামিতির উদ্ভব সামাজিক প্রয়োজনীয়তা (জমির মাপ ঘরবাড়ি তৈরি ইত্যাদি) থেকেই।

এই যুগেই অ্যারিস্টটল শুধু পৃথিবীর আকারের ধারণাই দিলেন না, তিনি পৃথিবীর পরিধিও বলে দিলেন। যদিও পরে দেখা গেল তা প্রকৃতপক্ষে যতটা অনুমান করা হয়েছিল তার প্রায় অর্ধেক। এইভাবে পৃথিবী থেকে মানুষের চোখের আন্দাজে তার আকৃতি-মাপ-তার অবস্থা জানার চেষ্টা চলতে থাকে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন পৃথিবী স্থির এবং বিশ্বজগতের কেন্দ্রে রয়েছে। ভারতের আর্যভট্ট নামক দার্শনিকও একই বিষয় চিন্তাভাবনা করছিলেন। তাদের ধারণা অনুসারে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য সহ গ্রহ, তারা, চাঁদ ঘুরপাক খাচ্ছে। অ্যারিস্টটলের যুগের আরেক দার্শনিক অ্যারিস্টার্কাস, অ্যারিস্টটলের সাথে দ্বিমত পোষণ করতেন এ বিষয়ে। তিনি মনে করতেন পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে নয়, সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তাঁর এমন ধারণার ভিত্তি হল – বড় অর্থাৎ ভারি বস্তুকে কেন্দ্র করে তার থেকে ছোটো অর্থাৎ হাল্কা বস্তু ঘুরবে। অ্যারিস্টার্কাসের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, দূর আকাশে যেসব তারা মিটমিট করে জ্বলছে, সেগুলো একেকটা সূর্য ছাড়া কিছু নয়।

অ্যারিস্টটলও পতনশীল বস্তুর ধারণায় মনে করতেন ভারি বস্তু আগে নীচে পড়বে, কারণ সেটা ভারি। কিন্তু ঘূর্ণায়মান বস্তুর ক্ষেত্রে কী হবে তা পৃথিবীতে বসে তার চারপাশে চলমান বস্তুর গতি দেখে বোঝাটা কঠিন ব্যাপার ছিল। অবশেষে সবাই অ্যারিস্টটলকেই মেনে নিল।

১৫০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে টলেমী নামের এক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের ভূকেন্দ্রীক ধারণাকে উর্ধ্বে তুলে ধরে মহাবিশ্বের একটা মডেল তৈরী করলেন। এই মডেলের কেন্দ্রে পৃথিবী, তাকে ঘিরে ঘুরে চলেছে সূর্য সহ আমাদের খালি চোখে দেখা গ্রহগুলো (এদের মধ্যে সূর্যকে, চাঁদকেও গ্রহ বলা হত)।

অ্যারিস্টটল থেকে টলেমীর মতো অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকরা যে স্থির পৃথিবীর কল্পনা করেছিলেন, তার কারণ তাদের চোখে (তাদের চোখ দিয়ে দেখা পৃথিবীর মানুষের চোখে) পৃথিবী তো স্থিরই মনে হত। চলন্ত গাড়ীতে বসে থাকা যাত্রী, গাড়ির জানালা দিয়ে দেখা বর্হিজগৎকে গতিশীলই দেখেন। আর নিজেকে মনে হয় স্থির। তাই আপাত ভাবে মনে হওয়া স্থির পৃথিবীর মানুষের চোখে বাকি সকল গ্রহ-উপগ্রহ গতিশীল মনে হয়। টলেমী লক্ষ্য করেন চাঁদের আকার পাল্টায় দিন-প্রতিদিন। কাছের জিনিস বড় দেখায়, আর দূরে জিনিস ছোট এমন ধারণা থেকে তাঁর মনে হল, পৃথিবীর

চারপাশে চাঁদের ঘূর্ণনের কক্ষপথ পুরোপুরি বৃত্তাকার নয়। টলেমীর তৈরী মহাবিশ্বের এই মডেলের সীমান্ত পার হলে সেখানে কী আছে জানা ছিল না। যদিও এই প্রশ্নটা মাথায় আসাটা স্বাভাবিক ছিল। তৎকালীন ইউরোপের খ্রীষ্ট ধর্ম টলেমির মডেল মেনে নিয়েছিল। ধর্মশাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে এই মডেলের মিল ছিল। এই মডেলের সব থেকে দূরের গোলোকের বাইরের জগৎকে খ্রীষ্টধর্মীরা স্বর্গ আর নরকের জন্য ছেড়ে দিয়েছিল। সমস্ত ধর্মের মতো ত্রিলোকের ধারণা এই মডেলে একেবারে খাপ খেয়ে গেল। যদিও টলেমীর মডেলে পৃথিবীর চারপাশের গ্রহগুলোকে দেখানো হলেও, আকাশে দৃশ্যমান বাকি তারাগুলোর কোন্ অবস্থানে আছে তা সুস্পষ্ট ছিল না। 'স্থির তারকা গোলক' – ছিল পরপর সমকেন্দ্রীক গোলকের সবথেকে বাইরে। এই গোলকের একটি ব্যবচ্ছেদের নীচের অংশে অন্ধকার আকাশে তারা দেখানো হতো। ধর্মবিশ্বাসী তথা ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের মনেও খটকার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সৃষ্টি করা জগৎ সম্পর্কে প্রশ্ন করা, সংশোধন করা, তাঁরই সৃষ্টি করা নগণ্য জীবের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্রশ্নগুলো রয়েই গেল।

টলেমি

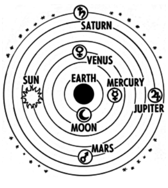

দাসযুগের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত এমনই চলেছে। দাসযুগের উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ হয়েছে, এক একজন দাস মালিকের দ্বারা অন্য অঞ্চল দখলের মধ্য দিয়ে। এই বিকাশই তার পতনের জমি খুঁড়লো। এক একজন দাসমালিকের অধীনে অনেক দাস থাকলেও উৎপাদিকাশক্তির তদনুপাতিক বিকাশ হচ্ছিল না। এর কারণ বন্দী দাসেরা নির্দেশের বাইরে কাজ করতো না। তারা দাস মালিকের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণে এই দাসেদের উপর নিপীড়ন চলতো অথচ তাতে উৎপাদন বাড়তো না। বিভিন্ন স্থানে দাস বিদ্রোহগুলো হয়েছিল এই দাসেদের মুক্ত করে দিয়ে জমির সাথে যুতে দিলে বরঞ্চ উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। এই সামাজিক চাহিদা তৈরি হয়েছিল। এতে দাস মালিকদের বোঝা বহনের মাথাভারি অবস্থার চাহিদা তৈরী হয়েছিল। এতে দাস মালিকদের বোঝা বহনের মাথাভারি অবস্থার অবসান হবে। অথচ অন্যভাবে ভূমিদাসদের নিজ কর্তৃত্বে রাখা যাবে। দাসযুগের মধ্যে তৈরী হওয়া সামাজিক প্রয়োজন সামন্ত যুগ আনলো। এই যুগের স্থায়িত্বকাল ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ এমন মোটামুটি কালপর্যায়। যদিও পৃথিবীর সর্বত্র এই কালপর্যায় একই ছিল না।

অ্যারিস্টার্কাস

সামন্তযুগেও অনেক প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়েছে। চুম্বকীয় কম্পাস আবিষ্কার হয়েছে দূরদেশ অভিযানে যাওয়ার জন্য। খনন কার্যের জন্য বারুদের আবিষ্কার হয়েছে। একসাথে অনেকগুলো প্রতিরূপ বা কপি তৈরী করে অনেককে পড়ানোর জন্য – জানানোর জন্য ছাপাখানার আবিষ্কার হয়েছে। চোখের ছানি অপারেশন সম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মধ্যে গণিতে পিথাগোরাসের উপপাদ্য। 'শূন্য'-র ব্যবহার শুরু হয়। এই সময়ই ইতালীতে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ শুরু হয়। এর মাধ্যমে 'মানবতাবাদ' নামক মতবাদের জন্ম হয়। এই যুগেরই অন্তিম পর্যায়ে এসে অ্যারিস্টটল থেকে টলেমীর বিশ্বধারণার বিপরীতে এক বৈপ্লবিক ধারণার উদ্ভব হয়।

১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে নিকোলাস কোপার্নিকাস নামের একজন পোলিশ পুরোহিত টলেমীর মডেলের পরিবর্তে নতুন এক বিশ্বজগতের ধারণা দিলেন। তিনি প্রথমে 'কক্ষপথে পরিক্রমণ' নামের একটা বই লেখেন। একে আরো বিবর্ধিত আকারে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লেখেন 'মহাকাশে জ্যোতিষ্কের পরিক্রমণ" নামের গ্রন্থ। এই বই ভূ-কেন্দ্রীক বিশ্বের জায়গায় সূর্যকেন্দ্রীক বিশ্বের ধারণা দিল, সূর্যকে ঘিরে গ্রহগুলোর বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তনের ছবি আবার পাওয়া গেল। আর বাকি আকাশের অসংখ্য তারারা আরো দূরে ওরকম বৃত্তাকার পথেই সূর্যকে ঘিরেই আবর্তমান। অ্যারিস্টটলের স্থির পৃথিবীর ধারণার বিপরীতে এই ধারণা ছিল।

মৃত্যুশয্যায় কোপার্নিকাস তাঁর লেখা বইটি হাতে পেলেন, অনেকের ধারণা ছিল তিনি মারা যাওয়ার সাথে সাথেই এই মতবাদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। কারণ মানব মনের চিন্তা মানব সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে বিকশিত হবেই। একে একে ব্রুনো, গ্যালিলিও আর কেপলারের জন্ম হল। যাঁরা কোপার্নিকাসের চিন্তাকে ধরে রেখে তাকে বিকশিত করলেন। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিন্দুর নাম এই ব্যক্তিরা এমন কিন্তু নয়। এঁরা এবং এঁদের চারপাশে থাকা অনেক মানুষ যাঁরা প্রত্যক্ষভাবেই তাদের সাহায্য করেছেন বা তাঁদের অপরিচিত অনেক মানুষকে নিয়েই কিন্তু একটা সামগ্রিক প্রক্রিয়া চলেছে।

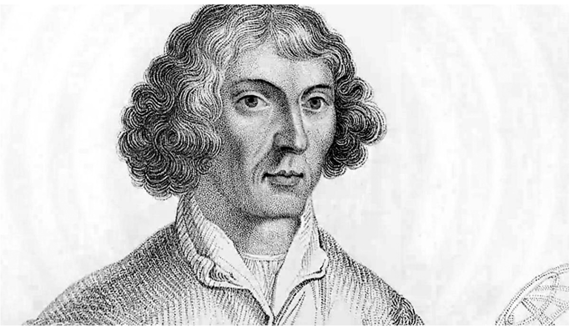

নিকোলাস কোপার্নিকাস

ইতালীর এক চাষি পরিবারে জন্ম নেওয়া একজন পুরোহিত ব্রুনোর ভূমিকা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনন্য। কোপার্নিকাস ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। আর জিওর্দানো ব্রুনো জন্মান ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানিতে অনেক ঘুরলেন এবং কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মডেলটা সবাইকে বোঝালেন। যাজক সম্প্রদায় এবং রক্ষণশীল সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে বিষিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ভেনিসের গির্জায় ধর্মের কান্ডারীরা তাঁকে বন্দি করলো। তাঁর বিচার চলাকালে নতি স্বীকার না করার পরিণাম স্বরূপ জীবন্ত দগ্ধ অবস্থায় শহীদের মৃত্যু বরণ করতে হল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী।

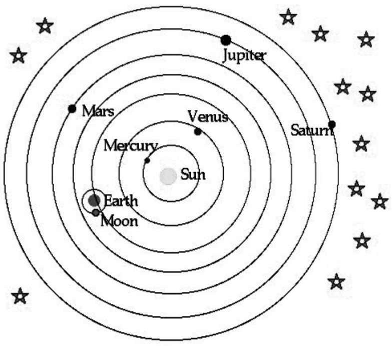

কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা

জিওর্দানো ব্রুনো

এর পরবর্তীকালে যে দুজন বিজ্ঞানীর নাম আসে তাঁর হলেন গ্যালিলিও গ্যালিলি এবং জোহানস্ কেপলার। এঁরা দুজনেই প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। এঁদের সময়কালের আগে পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে বিশ্বজগৎকে, তার সমস্ত কিছু কিভাবে চলছে, তা জানার আগ্রহ মেটাতে হয়েছে খালি চোখে দৃশ্যমান পৃথিবী আর যতদূর দেখা যায় এই আকাশকে পর্যবেক্ষণ করে। মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণের এই সীমারেখাকে আমরা নিম্নরূপে পাই ঃ

	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
তখনো পর্যন্ত মহাবিশ্বে –		
১) দৈর্ঘ্য	এক মিলিমিটারের অর্ধেক	পৃথিবীর পরিধিরও কম
২) ভর	এক মিলিগ্রাম	পৃথিবীর ভরের থেকে কম
৩) সময়	একবার চোখের পলক পড়া পর্যন্ত সময়াবকাশ	ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত পৃথিবী তথা জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে সেই সময়কাল পর্যন্ত

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পরিমাপের সীমারেখা দেখে আমরা বলতেই পারি মানুষের জানার জগৎ কতটাই সংকীর্ণ ছিল। যদিও এই ক্ষুদ্র পরিসরকেই ভেবে মানুষ অবাক বিস্ময় জগতের সৃষ্টি রহস্যে হতবাক হয়েছে। কিন্তু এতকালের স্থির চিন্তার দর্শনে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত স্থির নির্দিষ্ট ফারমান তারা মেনে আসলেও কোপার্নিকাস পুরো ব্যাপারটা উল্টে দিয়ে বস্তুকে উল্টোদিক থেকে দেখার চোখ তৈরী করে দিলেন। চলন্ত গাড়ীতে বসা সেই যাত্রী এখন এভাবেও ভাবতে লাগলো যে সে স্থির হয়ে আসনে বসে থাকলেও গাড়ীর চলনের সাথে সাথে আসলে সেও গতিশীল। বাইরের গাছপালাগুলোকে আর গতিশীল বলে ভ্রম হল না। যা চোখে দেখছি, তা নয়। যা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখছি – তাই সত্যি হল। এভাবে চিন্তার গজতে বিপ্লব ঘটে গেল। (চলবে)

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

মহাবিশ্বের সবচেয়ে দূরের নক্ষত্র "ইকরাস" এর সন্ধান

মহাকাশে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে ভাসমান প্রথম এবং এখনো পর্যন্ত একমাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র হলো – হাবল্-স্পেস টেলিস্কোপ। সম্প্রতি মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা দাবি করেছে যে হাবল টেলিস্কোপে এক নীলচে তারা অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। হিসাব কষে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ঐ নক্ষত্র থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে সময় লাগছে পাক্কা ৯০০ কোটি বছর। অর্থাৎ পৃথিবী ও নক্ষত্রের দূরত্ব ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ। বিজ্ঞানীরা এই নক্ষত্রের নাম দিয়েছেন, "ইকরাস"। বর্তমানে এটিই পৃথিবীর দূরতম নক্ষত্র। আজ পর্যন্ত গবেষণার নিরীখে বিজ্ঞানীদের মতে ব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি আজ থেকে ১৩৭০ কোটি বছর পূর্বে। ৯০০ কোটি বর্ষ পূর্বে, "ইকরাস" যে আলো পাঠিয়েছিল তা তা আজ নাসার টেলিস্কোপে ধরা পড়লেও এটির বর্তমান অবস্থা বর্তমানে জানা সম্ভব নয়। ■

মিল্কিওয়ে-তে হাজার হাজার ব্ল্যাকহোল

নাসার "চন্দ্র এক্স-রে অবজারভেটরি"-র ১২ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং হিসাব কষে, জ্যোতি-পদার্থবিদ চাক্ হেইলীর নেতৃত্বাধীন আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দল সম্প্রতি "মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি"-র ঠিক মাঝখানে হাজার হাজার ব্ল্যাক হোলের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করেছে। তাদের গবেষণা পত্রটি আন্তর্জাতিক গবেষণা জার্নাল "নেচার" এর ৪ঠা এপ্রিল ২০১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই ব্ল্যাকহোলগুলি মিল্কিওয়ের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল যার নাম "স্যাজিটারিয়াস এ স্টার" এর আশেপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। ১৯৯৩ সালে এই ব্ল্যাক হোল গুলির অস্তিত্বের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্ক মরিস। গবেষক চাক হেইলী তার গবেষণা পত্রে লিখেছেন যে এই ব্ল্যাকহোল গুলির প্রত্যেকটি "বাইনারি সিস্টেমে" আছে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ব্ল্যাক হোল একটি করে তারার সঙ্গে জোড় বেঁধে আছে। ■

ত্রি-মাত্রিক এক্সরে

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয় পদ্ধতিতে অভূতপূর্ব সংযোজন হলো ত্রি-মাত্রিক রঙিন এক্স রে সার্ন এর বিজ্ঞানীরা কণা সন্ধানী প্রযুক্তি (পার্টিক্যাল ট্র্যাকিং টেকনোলজি) ব্যবহার করে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের মাধ্যমেই এই আবিষ্কার করেছেন। সার্নের গবেষক দলের প্রধান ফিল বাটলারের দাবি আর কোন যন্ত্রই এত নির্ভুল ছবি তুলতে পারে না। এই বিশেষ রঙিন এক্স রে শরীরের অস্থি, তরুনাস্থি ও পেশিগুলিকে আরও স্পষ্ট ও পৃথকভাবে দেখাতে পারবে। ফলে সহজেই আঘাতের প্রকৃতি ও স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

সার্নের এই প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগাচ্ছে নিউজিল্যান্ডের এক বহুজাতিক কোম্পানী। কোম্পানীর এই কাজে সাহায্য করছে ইউনিভার্সিটি অফ ওটাগো এবং ইউনিভার্সিটি অফ কন্টারবেরি। ■

স্পাইরুলিনা শৈবাল নয়, ব্যাক্টেরিয়া – বিকল্প খাদ্য!

স্পাইরুলিনা এতদিন এক প্রকার নীলাভ-সবুজ শৈবাল রূপে পরিচিত ছিল। ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ সালোকসংশ্লেষে সক্ষম হওয়ায় এই জলজ জীবকে শৈবাল বলা হতো। কিন্তু জেনেটিক্স, ফিজিওলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রির নতুন বিশ্লেষণে বিজ্ঞানীরা স্পাইরুলিনা কে ব্যাক্টেরিয়া রাজ্যে স্থানান্তরিত করেছে। এরা এক প্রকার সায়ানো ব্যাক্টেরিয়া। এরা সাধারণত সমুদ্রে এবং Subtropical Climate বা উপ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের লবণ হ্রদে জন্মায়।

স্পাইরুলিনা'র খাদ্যগুণ অপরিসীম, যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। বিগত একশত বছরে বিশ্বব্যাপী এর চাষও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে ৬০%-৭০% প্রোটিন, কার্বোহইড্রেড, এবং প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বর্তমান। নাসা থেকে বলা হয়েছে এর খাদ্যগুণ এমন যে ১০০০ কেজি ফল-সব্জীর সমতুল্য খাদ্যগুণ পাওয়া যাবে মাত্র ১ কেজি স্পাইরুলিনা থেকে। এই কারণে নাসা এবং ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সিকে মহাকাশ যাত্রায় খাদ্য ও পুষ্টির জন্য স্পাইরুলিনা ব্যবহার করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ এর মতে স্পাইরুলিনা এবং জিঙ্ক এর সংমিশ্রনে প্রস্তুত খাদ্য, আর্সেনিক প্রবণ অঞ্চলের মানুষের শরীর থেকে আর্সেনিক নির্গমনের

সহায়ক। ২০১৭ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল রিসার্চ' জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে যে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগছে এমন গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে খাদ্যের বিকল্প রূপে স্পাইরুলিনার ব্যবহার ভালো ফল দিয়েছে।

কিন্তু স্পাইরুলিনাকে খাদ্যের বিকল্প রূপে ব্যবহার করা নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। বর্তমানে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে। তাই এখনই স্পাইরুলিনাকে বিকল্প খাদ্য বলা যায় কি না তা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে দ্বিমত আছে।■

কিডনি প্রতিস্থাপনে নতুন Immuno suppressive চিকিৎসা

আমেরিকার Cedars Sinai Medical Center, সুইডেনের Uppasala University, Karalinska Institute এবং Karolinaska University Hospital, এবং বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি'র গবেষকদের যৌথ প্রচেষ্টায় এক নতুন ধরনের Immuno suppressive চিকিৎসার উদ্ভব হয়েছে। এই পদ্ধতিতে বৃক্ক প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে শরীরবৃত্তীয় ভাবে বাতিলের ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। এই গবেষণার কথা ২০১৭ সালে "নিউ ইংলন্ড জার্নাল অব মেডিসিন"-এ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি হলো IdeS। IgG হলো এক প্রকার অ্যান্টিবডি যা কোন অ্যান্টিজেন বা দেহের বহিরাগত কোনো বস্তুকণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভুদ হয়।IdeS মানবদেহের IgG কে ভেঙ্গে দেয় যার ফলস্বরূপ অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে IgG দ্বারা প্রতিস্থাপিত অঙ্গকে বহিরাগত বিবেচনা করে তাকে বাতিল করার পদ্ধতিটি খারিজ হয়।

HLA এর অর্থ হিউম্যান লিউকোসাইট অ্যান্টিজেন, যা প্রতিস্থাপিত অঙ্গ বাতিলের জন্য দায়বদ্ধ। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ৪ থেকে ৬ ঘন্টা পূর্বে রোগীকে ১৫ মিনিটের অধিক সময় ধরে IdeS দেওয়া হয়। এর ফলে উল্লেখযোগ্যভাবে IgG HLA অ্যান্টিবডি হ্রাস পায় এবং প্রতিস্থাপিত অঙ্গ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। ২৫ জনের বেশি HLA অধিক সক্রিয় রোগীর বৃক্ক প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ২৪ জনার ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়া গেছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হলো, সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর তুলনায় খুবই স্বল্প সংখ্যক রোগীর উপর এর প্রয়োগের ফলাফল দাঁড়িয়ে আছে।■

ওড়িশায় পৃথিবীর প্রাচীনতম খনিজের সন্ধান মিলল

১৯৮১ সালে 'সায়েন্স' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে জানা গিয়েছিল যে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূ-তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অজিত কুমার সাহা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশিস রঞ্জন বসু পূর্ব ভারতের ওড়িশায় প্রাপ্ত আগ্নেয়শিলার (গ্রানাইট) বয়স রেডওমেট্রিক পদ্ধতিতে প্রায় ৩৮০ কোটি বছর বলে দাবি করেছিলেন। সেই দাবি অনুযায়ী এই পাথরটি পৃথিবীর প্রাচীনতম বলে চিহ্নিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই দাবির বিরোধিতা করেন। অধ্যাপক সাহা এবং বসু ১৯৯৫ সালে পুণরায় গবেষণার পর স্বীকার করে নেন যে তাদের বয়স নির্ধারণের পদ্ধতিতে ভুল হয়েছিল এবং ওই শিলাটির বয়স হবে ৩৫০ কোটি বছর।

সম্প্রতি মালয়েশিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের শিক্ষক (পূর্বে তিনি কলকাতার আশুতোষ কলেজ এবং ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সস্টিটিউটের অধ্যাপক ছিলেন) রজত মজুমদার, তার ছাত্রী ত্রিসোতা চৌধুরী এবং চিনা বিজ্ঞানী ইউশেং ওয়ান "সেন্সিটিভ হাই রেজল্যুশন আয়ন মাইক্রোস্কোপ" দ্বারা বিশ্লেষণ করে জানান (নেচার পত্রিকায় ৪ঠা মে ২০১৮ প্রকাশিত) ওড়িশার চাম্পুয়া অঞ্চলের গ্রানাইট পাথরে পাওয়া জারকন খনিজ (জারকনিয়াম সিলিকেট – $ZrSio_4$) এর বয়স ৪২৪ কোটি বছর। এই জারকন খনিজ গলিত লাভা থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রস্তরীভূত হয়েছিল যে সময় তার বয়স আজ থেকে ৪২৪ কোটি বছরের নিকটবর্তী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জারকন এমন একটি খনিজ (mineral) যা চাপে-তাপে গঠনের পরিবর্তন না করায় তরল লাভা থেকে কেলাসিত হওয়ার সময়কালকে সংরক্ষিত করে রাখে। জারকনের মধ্যে প্রচুর U, K, Pb থাকে এবং U-Pb পদ্ধতিতে বয়স নির্ধারণ সহজ হয় অন্যান্য খনিজের তুলনায়।

প্রসঙ্গত বলা যায় যে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পাথরে এর আগে জারকন থেকে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪৪০ কোটি বছর। কিন্তু এই জারকন যেহেতু পাললিক শিলায় পাওয়া গেছে তাই এই জারকন (Detrital Zircon) ওই পাথরের সঠিক বয়স নির্ধারণ করে না (সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন)। এর আগে আগ্নেয় শিলার জারকন থেকে পৃথিবীর প্রাচীনতম আগ্নেয় শিলার যে বয়স পাওয়া গেছে তা যথাক্রমে ৪০০, ৪০০ এবং ৪১০ কোটি বছর (কানাডা, চিন এবং ব্রাজিলে)।■

তেলেঙ্গানার কালেশ্বরম প্রকল্প বিশ্বের বৃহত্তম পাম্প সেচ প্রকল্প

ভারতের তেলেঙ্গানায় নির্ণীয়মান কালেশ্বরম সেচ প্রকল্প এযাবৎ বিশ্বের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। তেলেঙ্গানা রাজ্যটির অধিকাংশ অঞ্চল দাক্ষিণাত্যের মালভূমির অংশ। এখানকার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০-৩৫০ মিটার। এই রাজ্যের গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চল থেকে উৎপন্ন গোদাবরী নদী। এই নদীখাতের গড় উচ্চতা এই রাজ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০-১০০ মিটার মাত্র। এছাড়া রয়েছে গোদাবরীর প্রধান উপনদী প্রাণহিতা এবং অন্যান্য। এই নদীগুলি মিলে প্রাণহিতা-গোদাবরী উপত্যকা তৈরি করেছে, যা সমগ্র তেলেঙ্গানার একটা ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে এই নদী থেকে তেলেঙ্গানা রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় নি।

নতুন প্রকল্প অনুযায়ী গোদাবরী-প্রাণহিতা নদীর মিলন স্থলে মেডিগাড্ডা জলাধারে জল এনে ফেলা হবে পাম্প প্রকল্পে। এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম পাম্প প্রকল্প, যার নিমার্ণে খরচ হবে আনুমানিক ৮০ হাজার কোটি টাকা। প্রকল্প চালু রাখতে আনুমানিক বার্ষিক খরচের পরিমাণ ১৩৯২৩ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের জন্য ১৩৯ মেগাওয়াটের পাম্প বসিয়েছে ভারত ইলেট্রনিক্স যা দিনে ২০ লক্ষ কিউবিক ফুট জলের সরবরাহ করবে আন্নারাম ও সান্ডিলা জলাধারে। জলাধার থেকে অভিকর্ষজ টানে ৩৩০ কিমি সুরঙ্গ, ১৮৩২ কি. মি দীর্ঘ খাল এবং পাইপের জটিল জালকে জল পৌঁছাবে রাজ্যের ১৩টি জেলার ১৮.৪৭ লক্ষ একর জমিতে। এই সেচের ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরামুক্ত হবে। জমি দোফসলী হবে। হায়দ্রাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদের মত শহরে জলের অভাব দূর হবে।

বিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধে গিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম এই সেচ প্রকল্প ধারাবাহিকভাবে কাজ করবে তো? এককালীন বিপুল বিনিয়োগ করে প্রকল্প চালু করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়মিত তাকে চালিয়ে না গেলে, জটিল প্রক্রিয়ায় সামান্যতম ঘাটতি কিন্তু প্রকল্পকে অকার্যকরী করে দেবে, প্রকৃতিগত সহায়তা পাওয়া যাবে না। প্রশ্ন উঠছে অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির ব্যাপক অনুসন্ধান করে বিকল্পের সন্ধান কি করা যেত না? সন্দেহ প্রকাশের কারণ – বর্তমান একচেটিয়া পুঁজিবাদের যুগে পুঁজিনিবেশ করে এককালীন বা স্বল্পকালীন মুনাফার তাগিদেই অধিকাংশ বিনিয়োগ হয়। প্রকল্পের কার্যকারিতা বা সমাজের কতটা উপকারে তা লাগল তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেচ্য হয় না।■

২০১৮ সালের নোবেল পুরস্কার

পদার্থ বিজ্ঞান ঃ ২০১৮ সালের মোট তিনজন বিজ্ঞানীকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। এরা হলেন আর্থার অস্কিন, জেরার্ড মৌরো এবং ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। এঁদের মধ্যে আর্থার অস্কিন নোবেল পুরস্কার পান অপটিক্যাল টুইজার আবিষ্কারের জন্য। এটি এমন একটি প্রযুক্তি যাতে লেজার রশ্মির সাহায্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যেমন একটি পরমাণু বা একটি ভাইরাস বা একটি জীবন্ত কোষকে আলাদা করে ধরা যায় এবং তাতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলানো যায়। ১৯৮৭ সালেই অস্কিন একটি জীবন্ত ব্যাকটিরিয়াকে লেজার টুইটারের সাহায্যে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমানে ওই প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে জীবন্ত কোষের মধ্যে ঘটে চলা বিভিন্ন ক্রিয়াকৌশল জানা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে জেরার্ড মৌরো ও ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড অদ্যাবধি মনুষ্য নির্মিত ক্ষুদ্রতম লেজার তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই উচ্চ প্রাবল্য বিশিষ্ট লেজার তরঙ্গ কোষকে অক্ষত রেখে ব্যবহার করা যেতে পারে। সূক্ষাতিসূক্ষ চক্ষু অপারেশনে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে নিখুঁতভাবে।

রসায়ন ঃ এবছর যে তিনজন বিজ্ঞানী রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তারা হলেন ফ্রান্সিস আর্নল্ড, জর্জ স্মিথ ও গ্রেগরি উইন্টার। ফ্রান্সিস আর্রল্ড পুরস্কার পেলেন উৎসেচকের বিবর্তনের উপর গবেষণা করে। উৎসেচক হল জৈব অনুঘটক। উৎসচকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেমন পরিপাক, রক্ত তঞ্চন ইত্যাদির গতি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। এই উৎসেচকগুলি কাজে লাগিয়ে পরিবেশ বান্ধব জৈব জ্বালানী উৎপাদনে সাফল্য পাওয়া গেছে। অন্যদিকে জর্জ স্মিথ ও গ্রেগরি উইন্টার বিবর্তন তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে সুদক্ষ অ্যান্টিবডি গঠনের পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার পেলেন। এই আবিষ্কার টক্সিনের বিষক্রিয়াকে নির্মূল করার ও ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য বিশেষ কাজে লাগবে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ বিজ্ঞানের এই শাখায় এবছর পুরস্কার পেলেন জেমস অ্যালিমন এবং টাকুসু হোজো। এই বিজ্ঞানীদ্বয় ক্যান্সার ইমিউনোথেরাপি আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার অর্জন করেছেন। এই পদ্ধতিতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কোষগুলি ক্যান্সার কোষগুলিকে চিহ্নিত করে তাকে আক্রমণ করে ও ক্যান্সার প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এতদিন ক্যান্সার চিকিৎসায় তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হতোঃ শল্য চিকিৎসা, রেডিও থেরাপি ও কেমো থেরাপি। এর সঙ্গে আরও একটি পদ্ধতি যুক্ত হলো তা হল ইমিউনো থেরাপি।■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

ক্লোন পদ্ধতি – এবার বানরের মধ্যে সাফল্য পেল

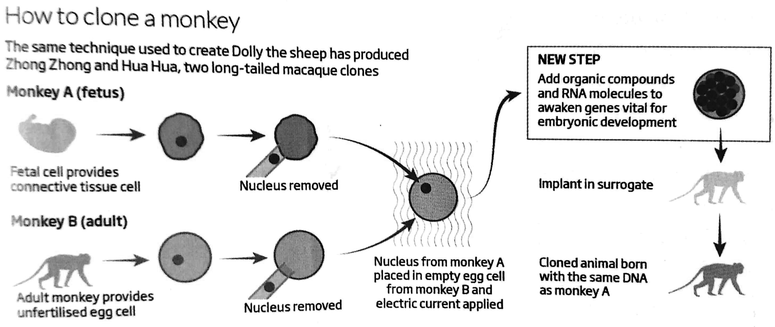

জীব বিবর্তনের ধারায়, "এপ বা প্রাইমেট থেকে মানুষ" – এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণ, এঙ্গেলসের মৃত্যুর (৫ই আগস্ট ১৮৯৫) প্রায় ১২৫ বছর পরেও অক্ষত। জীব বিজ্ঞান আজ জেনেটিক্স, মাইক্রোবায়োলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, মলিকুলার বায়োলজি প্রভৃতি শাখা প্রশাখায় পল্লবিত। আজ পর্যন্ত আবিস্কৃত বিবর্তনের সংশ্লেষ তত্ত্ব, জেনেটিক্যাল ইভলিউশন ও অন্যান্য আধুনিক তত্ত্ব এঙ্গেলসের এই বিশ্লেষণটিকে আঘাত না করে আরও পোক্ত করেছে। আজও জীব বিজ্ঞানের প্রয়োগিক ক্ষেত্রে প্রাইমেটের ওপর সাফল্য, জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার সম্ভবনা বাড়িয়ে দেয়।

জীব বিবর্তনের ধারায় যেমন নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে তেমনই বিলুপ্ত হয়েছে বহু প্রজাতি। আর প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা পেয়েছে প্রাকৃতিকভাবে অর্জিত জনন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বিবর্তনের ধারায় নতুন প্রজাতির উৎপত্তি এবং তার অস্তিত্ব রক্ষার জনন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, "ডিম আগে না মুরগী আগে" প্রশ্নটির সমাধান করেছে। জীব যে জনন প্রক্রিয়ায় নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান একদিকে যেমন টেস্ট টিউব বেবি তৈরীকে সক্ষম করে তুলেছে অন্য দিকে তেমনি ক্লোন পদ্ধতিতে নিষেক ব্যতিরেকে নতুন সন্তান সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত ক্লোন পদ্ধতিতে সাফল্য স্তন্যপায়ীদের নিম্নস্তরের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। এবার সে সাফল্য মানুষের খুব কাছাকাছি প্রাইমেটদের মধ্যে পাওয়া গেল।

সেল নামক জার্নালে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ২০১৮, প্রকাশিত এক গবেষণা পত্রে জানান হয়েছে সাংহাই এর চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এর বিজ্ঞানীরা লম্বা লেজ বিশিষ্ট এক বিশেষ প্রকার বানরের (ম্যাকাও) ক্লোন তৈরিতে সাফল্য পেয়েছে। ম্যাকাও বানর শাবক দুটির নাম দেওয়া হয়েছে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া। অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস দেহ কোশের নিউক্লিয়াস দ্বারা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে ক্লোনিং করা হয় [Somatic Cell Nuclear trarsfer (SCNT)] "ডলি"র জন্মও এই পদ্ধতি হয়েছিল। চীনের প্রাচীন নাম ছিল ঝং হুয়া, তা থেকেই বানর দুটির নাম রাখা হয়েছে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া। বুদ্ধিজীবীদের এক অংশের মতে এই রূপ নাম-করণের পিছনে, বিজ্ঞানের জগতে চীনের প্রতিপত্তি দেখানোর চেষ্টা।

ডলি

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে ক্লোনিং পদ্ধতিতে "ডলি"র জন্মই বিজ্ঞানী মহলের বাইরে শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত মানুষের কাছে ক্লোনিং পদ্ধতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ তৈরী করেছিল। কেননা প্রচার মাধ্যম প্রচার করেছিল "ডলি" কোন প্রাকৃতিক জনন প্রক্রিয়ায় জন্মায় নি। এই পদ্ধতিতে মানুষের "ক্লোন" তৈরী এক দিন সম্ভব হবে। সুতরাং সন্তানহীন দম্পতিদের সন্তান লাভের আরও একটা উপায় হয়ে উঠতে পারে এই ক্লোনিং পদ্ধতি। ফলে টেস্টটিউব বেবি, গর্ভদান-র মতই বিজ্ঞানের এই নতুন আবিষ্কারটিও একটি ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করতে পারে।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কটিশ সেন্টার ফর রিজেনারেটিভ মেডিসিন-এর স্যার আয়ান উইলমার্ট-এর গ্রুপের হাতে ডলির জন্ম। ডলির "ক্লোন" ও দেহকোশের নিউক্লিয়াস দ্বারা অনিষিক্ত ডিম্বানুর নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতেই হয়েছিল। প্রথমে ডিম্বানুর নিউক্লিয়াস বের করে ফেলা হয়। তারপর দেহকোশের নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াস বিহীন ডিম্বানুর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। নিউক্লিয়াস বিহীন ডিম্বানুতে দেহকোশের নিউক্লিয়াস রোপন করার ফলে যা উদ্ভুদ হয় তাই হলো ক্লোন।

ডলির ক্লোন তৈরী হয়েছিল ৬ বছর বয়স্ক এক ফিন ডরসেট ভেড়ার স্তন গ্রন্থির কোশের [দেহ কোশ] নিউক্লিয়াস কালো মুখওয়ালা স্কটিশ ভেড়ার নিউক্লিয়াস বিযুক্ত ডিম্বানুতে রোপন করে। "ডলি" তার পালিত মাতা কালো মুখওয়ালা স্কটিশ ভেড়ার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয় ৫ই জুলাই ১৯৯৬। গর্ভদানকারী মাতার সঙ্গে গডলির ডিএনএ-র যে সম্পর্কে নেই তার প্রথম প্রমাণ হলো ডলির মুখ সাদা। ডলির ডিএনএ সংগৃহীত হয়েছিল ফিন ডরসেট ভেড়ার স্তন গ্রন্থির কোশ থেকে। ডলি পার্টন নামক সঙ্গীত শিল্পীর নাম অনুসারে তার নাম রাখা হয় ডলি।

দ্য রসলিন ইনস্টিটিউট-এ অন্যান্য ভেড়াদের সঙ্গে ডলি

একেবারে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করেছে, মাঝে মাঝে তাকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে হাজির হওয়া বাদে। পুরুষ সঙ্গী ডেভিড এর সঙ্গে সহবাসে ডলি ছয়টি মেষ শাবকের জন্ম দেয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিলে তাদের প্রথম সন্তান বনি জন্মায়। এরপর যোমজ সন্তান হলো স্যালি এবং রোজি। শেষ তিনটি শাবক হলো লুইসি, ডারসি এবং কটন। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডলির মৃত্যু হয়। তার মৃত দেহ, স্কটল্যান্ডে এডিনবার্গ ন্যাশনাল মিউজিয়াম-এ ঐতিহাসিক নমুনা স্বরূপ সংরক্ষিত করা হয়। ডলি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক।

ডলি, বিজ্ঞানীমহলে অন্যান্য উন্নত প্রাণী, এমনকি মানুষের ক্লোন করার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। প্রচেষ্টাও শুরু হয়। কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্নে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। আসলে নৈতিকতাটি হলো পরিবার ভিত্তিক একগামী স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। টেস্ট টিউব বেবির ভ্রূণ সৃষ্টি হয় ডিম্বানু ও শুক্রানুর নিষেকে মাধ্যমে। ফলে সামাজিকভাবে বংশের ধারা রক্ষিত হয়, যা আইনসিদ্ধ দত্তকের চেয়েও বেশি আপন। কিন্তু ক্লোন পদ্ধতিতে দেহ কোশের নিউক্লিয়াস অপত্যের মধ্যে ডিএনএ বহন করে, নিষেকের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ ক্লোন পদ্ধতিতে অপত্য সৃষ্টির জন্য বিপরীত লিঙ্গের জোড়ের প্রয়োজন নেই। সুতরাং ক্লোন পদ্ধতি একক পতি-পত্নি ভিত্তিক পরিবারের মৌলিক চাহিদাটি অস্বীকার করে, ফলে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারের সামাজিক নিয়মটি শিথিল হয়ে পড়ে। "ক্লোন" পদ্ধতির জেনেটিক্যাল ও ফিজিওলজিক্যাল দোষ-গুণ, সুবিধা-অসুবিধার বিচার ব্যাখ্যা না দিয়ে মানব সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কার অজুহাতে অষ্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, কানাডা সহ বিশ্বের বেশির ভাগ দেশে মানুষের ক্লোন তৈরী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাশিয়া, সংযুক্ত রাজ্যের মতন কয়েকটি দেশে Thearapeatic Human Cloning আইন স্বীকৃত কিন্তু Reproductive Human Cloning নিষিদ্ধ। এটাই হলো বিজ্ঞানের গবেষনায় আইনী প্রতিরোধ অর্থাৎ রাজনৈতিক বাধা।

বিজ্ঞানীরা SCNT পদ্ধতিতে ইঁদুর, গরু, মোষ, কুকুর প্রভৃতি প্রাণীর ক্লোন তৈরী করতে সক্ষম হলেও এতদিন পর্যন্ত প্রাইমেটদের ক্লোন তৈরী করতে পারে নি। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে রেসাস বানরের ক্লোন তৈরী সম্ভব হয়েছিল Embryo Splitting পদ্ধতিতে এবং Tetra নামে একটি স্ত্রী বানর ভূমিষ্টও হয়েছিল। ভ্রূণ যখন ৮ টি কোশের সমষ্টি রূপে অবস্থান করে তখন এই পদ্ধতিতে দুটি করে কোশ বিশিষ্ট চারটি সদৃশ্য ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে Pittsburg এর বিজ্ঞানীরা প্রাইমেটদের ৭১৬ টি ডিম্বাণু নিয়ে SCNT পদ্ধতিতে ক্লোন তৈরী চেষ্টা করেন। কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও সফল হন নি। ফলে বিজ্ঞানী মহলে ধারণা হয় SCNT পদ্ধতিতে প্রাইমেটের ক্লোন তৈরী সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে চীনা বিজ্ঞানীরা ২৯০ টি প্রচেষ্টায় ১৯২টি ভ্রূণ তৈরী করে এবং ২২টি ক্ষেত্রে গর্ভবতী হয় এবং ২টি জীবিত বানর ভূমিষ্ট হয়। কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেই দুটি মারা যায়।

এরপর ভ্রূণের দেহের যোগ কলার কোশ ব্যবহার করে চীনা বিজ্ঞানীরা ১৩৭ টি ক্ষেত্রে ১০৯ ভ্রূণ তৈরী করে, ৬টি গর্ভবতী করে এবং দুটি মহিলা বানর শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছে। যেহেতু একই বানরের দেহ কোশ থেকে গঠিত তাই তারা যমজ হয়েছে। এই পদ্ধতিতে চীনা বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক পর্যায় দুটি রাসায়নিক পদার্থ trichostatin A এবং Kdm4-d ব্যবহার করে। পাশাপাশি দাতা DNA এর জন্য awakeing genes neede to produce an entire organismকর্মসূচীটি কার্যকরী করায় SCNT ডিম্বাণু দ্রুত ভ্রূণে পরিণত হয়েছিল এবং স্বাভাবিকভাবে নিষিক্ত ডিম্বাণুর ন্যায় দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া – একমাত্র সাফল্য অর্থাৎ সাফল্যের হার সামান্য এবং প্রাপ্ত বয়স্কের দেহকোশ ব্যবহার করেও এটা সম্ভব হয় নি।

প্রাইমেটের সঙ্গে মানুষের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং জেনেটিক্যাল সাদৃশ্য সবচেয়ে বেশি। তাই প্রাইমেটের ক্লোন তৈরী সম্ভব হওয়ায়, মানুষের ক্লোন তৈরীর পথ অনেকটা সহজ হল বলা যায়। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে উ সুক একবার মানুষের ক্লোন তৈরীতে সাফল্য পেয়েছেন বলে দাবি করেন। পরে জানা যায় যে এটি বৈজ্ঞানিক জালিয়াতি এর একটি উদাহরণ মাত্র। মানুষের ক্লোন তৈরী সম্ভব হলে, বিজ্ঞানীদের মতে অ্যালঝাইমার্স, পারকিনসন্স এবং ক্যান্সারের মতন রোগগুলির কারণ জানা ও চিকিৎসা সহজ হবে।

২০১৬ সালে জাপানী বিজ্ঞানীরা, In vitro Gametogenesis (IVG) পদ্ধতিতে ইঁদুরের চামড়ার কোশ থেকে ডিম্বাণু তৈরী করেছে। Oregon Health and Science Universtity-র বিজ্ঞানী Shoukhart Mitalipou জিন এটিডিং প্রযুক্তির প্রয়োগে সাফল্যের সঙ্গে মানুষের ভ্রূণের edit করেছেন।

ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া'র জন্মের ফলে মানুষের ক্লোন তৈরীর জন্য নৈতিকতার প্রশ্নটি পুনরায় সামনে উঠে এসেছে। বিশ্বব্যাপী বহু বিজ্ঞানী এবং ধর্মের কান্ডারীরা মানুষের ক্লোন তৈরীর বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

Henry Greely তাঁর "The End of Sex and the Future of Human Reproduction" বইতে লিখেছেন, "Within twenty, may be forty years most people in developed countries will stop having sex for the purpose of reproduction". ■

বিজ্ঞানের বিশেষ খবর ঃ

ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে টেলিস্কোপ ব্যবহারের চারশো বছর পূর্ণ

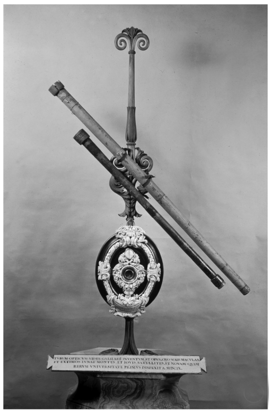

ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের জন্য, সপ্তদশ শতাব্দীতে, টেলিস্কোপের ব্যবহারের তিনটি সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। এগুলি হলো –

(১) ১৬৮৯ খ্রীঃ ফরাসী বিজ্ঞানী Jean Richard দ্বারা

(২) ১৬৫১ খ্রীঃ বৃটিশ বিজ্ঞানী Jeremiah Shakerley দ্বারা

(৩) ১৬১৮ খ্রীঃ Father Kerwitzer দ্বারা।

Father Kirwitzer ছিলেন একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারী বিজ্ঞানী। তিনি Bohemia সংস্কৃতি ও ধর্মীয় শিক্ষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গ্যালিলিও যখন রোমে টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মতবাদকে খন্ডন করে সূর্য কেন্দ্রীক বিশ্বের মতবাদ প্রকাশ করছেন সেই সময় ঐ কলেজের সদস্য ছিলেন Kirwitzer। Kirwitzer তখন কোপার্নিকাসের মতবাদে অভিভূত হন এবং গ্যালিলিওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর তিনি গভীরভাবে জ্যোতির্বিদ্যায় ও গণিতশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন। এখানেই তিনি প্রথম খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের চীনে কাজ করার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞাত হন।

খ্রীষ্টীয় সংঘের বহু সদস্যকে গণিত, ভূগোল এবং জ্যোতির্বিদা সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করা হতো এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তারা তৎকালীন ইউরোপে বিজ্ঞানের উন্নতিকে বিশ্বব্যাপী বিস্তার করবে। লিসবন থেকে সুদূর প্রাচ্যে নোঙর ফেলার জন্য দীর্ঘ যাত্রাপথে সাময়িক বিরতির জন্য মিশনারীরা ভারতের গোয়া এবং চীনের ম্যাকাওকে বেছে নিয়েছিল। পর্তুগীজ বাণিজ্যিক ভিত্তি তখন চীনের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোয়ায় খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা অধিপত্য বিস্তার করেছিল ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ থেকে। লিসবন থেকে জল পথে গোয়া আসতে তখন সময় লাগত ছয়মাস, গোয়া থেকে চীনে যাত্রা করার জন্য তাদের ৬ মাস অপেক্ষা করতে হতো পালতোলা নৌকায় বায়ু প্রবাহের সুবিধা গ্রহণের জন্য। মিশনারীদের একটা অংশ Nicolas Trigault (১৫৭৭-১৬২৮ খ্রীঃ) এর নেতৃত্বে চীন সফরে ছিল। ১৬১৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে Kirwitzer লিসবন থেকে নৌকা যাত্রা শুরু করেন। দীর্ঘ দিন জলপথে কঠোর প্রতিকূলতা সহ্য করে ১৬১৮ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর গোয়ায় পৌঁছান। এই যাত্রপথে ২২ জন সহযাত্রীর মধ্যে ৫ জন অসুস্থ হয়ে মারা যায়।

১৬১৮ খ্রীঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য সময়। ঐ বছর খুব অল্প দিনের মধ্যেই আকাশে তিন তিনবার ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে। ১৬১৮ খ্রীঃ এমন একটা যুগে অবস্থান করছে যখন গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ মারফৎ আকাশের পর্যবেক্ষণ যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা স্বর্গের ধারণাকে বাতিল করেছে, জোহানস কেপলার জ্যোতির্বিদ্যার গাণিতিক বিশ্লেষণের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলির কক্ষপথকে পুর্ণসঙ্গায়িত করার মাধ্যমে। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে, গোয়ায় ভোরের আকাশে Father Kirwitzer একের পর এক, দুটি ধূমকেতুর অসাধারণ লেজ দেখতে পান। তিনি ল্যাটিন ভাষায় তাঁর লিখিত "Observations Comtarum Anni 1618" প্রবন্ধে এবিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এই প্রবন্ধের একটি মাত্র কপি Austrian National Library তে সংরক্ষিত আছে। ২০১৪ খ্রীঃ এটির পুণর্মুদ্রণ করা হয়।

এই গবেষনা প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত, মাত্র ২৪ পাতার। কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম কারণ এর রিপোর্ট থেকেই জানা যাচ্ছে যে এটাই ছিল ইউরোপের বাইরে প্রথম আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং এটাই ছিল ভারতে প্রথম যন্ত্রের মাধ্যমে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ।

ধূমকেতু পর্যবেক্ষণের অনুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে Kirwitzer যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন তা ছিল দীর্ঘ নলাকার। নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে তিনি গ্যালিলিও টেলিস্কোপই ব্যবহার করেছিলেন – যা তাদের সংঘ জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত মাপজোকের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সঙ্গে ইউরোপ থেকে সংগ্রহ করে এনেছিল।

তিনি ১৬১৮ খ্রীঃ নভেম্বরে দেখা ধূমকেতুর বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথম ধূমকেতু ও দ্বিতীয় ধূমকেতু বলে উল্লেখ করেছেন যা বর্তমানে C/1618 VI এবং C/1618 WI রূপে পরিচিত। ভোরের আকাশে যখন ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটে তখন তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য তিনি অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি নথিভুক্ত করেছেন যে ১০ই নভেম্বর ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করেন। তিনি আরও লিখেছেন ঐ দিন বহু স্থানীয় মানুষ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল – ভোরের আকাশে যে প্রচন্ড আলোর দীপ্তি দেখা গিয়েছিল তা আসলে কি জানতে। তিনি নিজে ঐ উজ্জ্বল আলোক ছটাকে ধূমকেতু বলে মনে করলেও অন্যদের বলেছিলেন ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তিনি বলবেন। তিনি অনুভব করেছিলেন এই নতুন বিষয় প্রমাণের জন্য যন্ত্রের এবং যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন। ঐ দিন তিনি গোয়ায় অবস্থানকারী Father Jacobus Rho এবং থেকে ৬৬০ কিমি

দূরে কোচিনে অবস্থানকারী Antonius Rubinus কে, ভোরের আকাশের ঘটনা জানিয়ে চিঠি লেখেন।

Kirwitzer তার গবেষণা মূলক গ্রন্থে বেশ কিছু স্থানের উল্লেখ করেছেন যে সকল স্থান থেকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এগুলি হলো গোয়ার Rachol এবং St. Pauls Collage, Panaji থেকে কিছু দূরে এবং Divar দ্বীপ। তিনি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন পর্যবেক্ষণে যা পেয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে যা যা পরিমাপ করেছিলেন – Altitudes, Azimuthus, Angular distance, Spica জ্যোতিষ্ক থেকে কৌণিক দূরত্ব (ডিগ্রিতে)। এগুলি যন্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের মনোভাব এবং ভোর বেলায় চাঁদের আলো এবং সূর্যের আভায় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যে ভ্রম সৃষ্টি হয়েছিল তারও উল্লেখ আছে।

সেই সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সব নক্ষত্রের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে পেরেছিলেন তাদের সাপেক্ষে ধূমকেতুর অবস্থান এবং লেজের অভিমুখ পর্যবেক্ষণ করতেন। প্রধান ধারাটি হল – ধূমকেতুর অবস্থান নির্ধারণ করা সূর্যের ক্রান্তিয় বৃত্তের মধ্যে। তার বর্ণনা থেকে বহু তথ্য পাওয়া গেলেও তাত্ত্বিক কিছু পাওয়া যায় নি।

তার নথিভুক্ত তথ্যের জন্য তিনি স্মরণীয় কারণ – তিনিই প্রথম স্বাধীনভাবে এবং এককভাবে ইউরোপের বাইরে জ্যাতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের জন্য Optical Device ব্যবহার করেন। এই তথ্যের অর্থ দাঁড়ায় ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রথম টেলিস্কোপের ব্যবহার হয় টেলিস্কোপ আবিষ্কারের এক দশকের মধ্যেই।

সম্রাট নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীরের বর্ণনা

চতুর্থ মোঘল সম্রাট নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা স্মরণীয় ঘটনা রূপে, পার্শি ভাষায় তাঁর রচিত 'তুজুক ই জাহাঙ্গীরী' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে গুজরাটের দোহাদ থেকে উজ্জয়নী হয়ে আগ্রা যাবার পথে মধ্যপ্রদেশের রামগড়ে প্রথম ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে সূর্যোদয়ের পূর্বে দিগন্ত রেখা বরাবর বাষ্পের উজ্জ্বল আলোক স্তম্ভের, যার মাঝখানটা মোটা আর দুই প্রান্ত সরু। দক্ষিণ প্রান্তটি দুর্বল দেখাচ্ছিল। এটি গতিশীল ছিল কারণ প্রথমে এটিকে দেখা যায় বৃশ্চিক রাশি-র কাছে, পরে দেখা যায় জ্যোতিষ্ক লিব্রা'র কাছে। এই ঘটনার ১৬ দিন বাদে, আকাশের একই জায়গায় এই ঘটনারই পুণরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু এই দ্বিতীয় ধূমকেতুর মাথাটা উজ্জ্বল থাকলেও লেজের দিকটা অনুজ্জ্বল ছিল। প্রথমটি দেখা যায় ১০ই নভেম্বর।

জাহাঙ্গীরের লিপিবদ্ধ তথ্য ১৬১৮ খ্রীঃ ১০ ই নভেম্বর ধূমকেতু আবির্ভাবের প্রমাণ বহন করছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রমাণিত যে তিনি নিজে দক্ষ জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং তাঁর পর্যবেক্ষণকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার চিহ্নও তিনি রেখে গেছেন।

১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী Jeremiah Shakerley বুধ গ্রহের চলন প্রত্যক্ষ করার জন্য ভারতে আসার পূর্ব পর্যন্ত Kirwitzer এর ধূমকেতু প্রত্যক্ষ করার ঘটনার তেমন কোন প্রচার ছিল না। ইংল্যান্ড থেকে সে সময় বুধ গ্রহের চলন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ছিল না বলেই তিনি ভারতে আসেন এবং গুজরাটের সুরাট থেকে ৩রা নভেম্বর ১৬৫১ সালে তিনি তা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি মাত্র ৮০ মিনিট বুধ গ্রহের চলন প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন।

Kirwitzer এবং Shakerley ভারতে টেলিস্কোপের সৃজনশীল ব্যবহার করেছেন। বিপরীতে Father Richurd ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞানে টেলিস্কোপের সুসংবদ্ধ ব্যবহার শুরু করেন। তিনি খ্রীষ্টীয় মিশনারী Sao Tome স্কুলে Mylapore (Chennai) জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা এবং শিক্ষাদান শুরু করেন এবং আমৃত্যু এই কাজই করে গেছেন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা তৎকালে এদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রতি কোন ধারাবাহিক আগ্রহকারীর জন্ম দেয় নি। তার সময়ে জ্যোতিষ্ক সংক্রান্ত বহু ঘটনা টেলিস্কোপের মাধ্যমে ভারতের আকাশে প্রত্যক্ষ করা গেছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর বৃটিশরা ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণে টেলিস্কোপ ব্যবহার করেছে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র চালু হয়। এরই উত্তরসূরী রূপে গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, বেঙ্গালুরু।

গোয়ায় থাকাকালীন Kirwitzer, তাঁর অধীনস্ত টেলিস্কোপের সাহায্যে তার সহযাত্রীদের নিয়মিত গ্যালিলিওর আবিষ্কার প্রত্যক্ষ করাতেন। লক্ষ্য করা যায় ভারতে থাকাকালীন সময়ে তার সতীর্থরা টেলিস্কোপ ব্যবহারে পারদর্শী হয়ে ওঠেন, কিন্তু তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত গ্যালিলিওর তত্ত্ব, কোপার্নিকাসের মতবাদ এবং কেপলারের গাণিতিক বিশ্লেষণের প্রচারের কোন প্রচেষ্টাই নেন নি।

প্রকৃতপক্ষে মিশনারিদের উদ্দেশ্য যা ছিল তারা তাই করেছেন। ব্যাপক মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলা তাদের কর্মসূচী ছিল না।

টেলিস্কোপ থেকে স্যাটেলাইট, গ্যালিলিও থেকে আইনস্টাইনের পথ ধরে স্টিফেন হকিং – এই পর্যায়ে মহাকাশ তথা জ্যোতির্বিজ্ঞানে মানবজাতি তত্ত্ব-পর্যবেক্ষণ-তথ্য-পুণঃপর্যবেক্ষণ – চক্রাকার পদ্ধতিতে যে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং করে চলেছে তাতে ধর্মীয় স্বর্গরাজ্যের বিলোপ ঘটেছে। তথাপি বিশ্বের ব্যাপক মানুষের মস্তিষ্কে কল্পিত স্বর্গরাজ্য বিরাজমান। এর এক এবং একমাত্র কারণ বিদ্যমান সমাজের অর্থনৈতিক নিয়মে বিশ্বের ব্যাপক মানুষ বৈষয়িক জীবনের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত। এর ফলেই অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্রের সৃষ্টি ও প্রসার ঘটেছে।

দূরদৃষ্টির অভাব দূরবীক্ষণ যন্ত্রে পূরণ হয় না। ■

[Science Reporter - NOV 2018 সংখ্যায় Prof Ramesh Kapoor এর "First Astronomical use of Telescope in India" শীর্ষক রচনা অবলম্বণে লেখাটি তৈরী ।]

চিঠিপত্র ঃ

মহাশয়,

আমি অরূপ সরদার, অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত। বিজ্ঞান মনস্কর মুখপত্র – সমীক্ষণ-এর নতুন গ্রাহক ও পাঠক। বিজ্ঞানের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণের জন্যই এই পত্রিকা পড়তে আমার ভালো লাগে। গত অষ্টম বর্ষের সংখ্যা-১, সপ্তমবর্ষের সংখ্যা-৩, সপ্তম বর্ষের সংখ্যা-২, সপ্তম বর্ষের সংখ্যা-১ এবং আপনার বিশেষ সম্পাদিত পত্রিকা 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি মানুষের সৃষ্টি' – এগুলি পড়ে আমি উপকৃত হয়েছি, আমার ধারণা স্বচ্ছ হয়েছে আর সর্বোপরি আমি আমার জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। আপনাকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আপনার সমীক্ষণ এর 'জিজ্ঞাসা ও তার সমাধান' প্রচ্ছদ নিবন্ধের জন্য। যেখান থেকে প্রশ্নকর্তা ও পাঠকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন। আমার প্রশ্নটি হল 'এক্স রশ্মি হীরে ভেদ করে যেতে পারে কিন্তু কাঁচ ভেদ করতে পারে না, অথচ ফাঁকা বোতলকে বায়ুনিরুদ্ধ করে তার মধ্যে বিদ্যুৎ চালিয়ে এক্স রশ্মি উৎপাদনের সময় তা কাঁচের বোতল ভেদ করে কিভাবে বাইরে আসে?'

আশা রাখি আমার উপরোক্ত প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে আমাকে বাধিত করবেন এবং আমার জিজ্ঞাসা পিপাসু মনকে পরিতৃপ্ততা দান করবেন।

২০.১০.২০১৮ অরূপ সরদার
দেওয়ানগঞ্জ, শ্রীকৃষ্ণনগর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সম্পাদকের উত্তর ঃ

প্রিয় পাঠক অরূপ,

পত্রিকা দপ্তরে পত্র মারফৎ প্রশ্ন প্রেরণের জন্য প্রথমে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। এবার তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাই – এক্স রশ্মির ধর্মাবলিতে লেখা আছে এক্স-রশ্মি কাঁচ ভেদ করতে পারে। তাই এক্স-রশ্মি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বায়ুনিরুদ্ধ কাঁচের বোতলের কাঁচ ভেদ করে এক্স-রশ্মি নির্গত হয়। এক্স-রশ্মি হীরেও ভেদ করতে পারে।

কিন্তু আসল প্রশ্নটা হলো এক্স-রশ্মি ব্যবহারকারী চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে (এক্স-রে ক্লিনিক) এক্স-রশ্মি উৎপাদক যন্ত্রটাকে কাঁচের সেপারেটর (separator) দিয়ে পৃথক করে রাখা হয় যাতে এক্স-রশ্মি বাইরের লোকজনের শরীরে প্রবেশ না করে। এক্স-রশ্মি যেহেতু কাঁচ ভেদ করে যেতে পারে তাহলে এটা কি করে সম্ভব?

এখন জানা দরকার, এক্স-রশ্মি উৎপাদনের কাঁচের বোতলের কাঁচ আর এক্স-রশ্মি উৎপাদক যন্ত্রকে পৃথক করে রাখার সেপারেটর বা পার্টিশন ওয়াল-এর কাঁচ এক নয়। এক্স-রশ্মি উৎপাদক কাঁচ নলের কাঁচের উপাদান হলো – সিলিকা, লাইম ও সোডা অ্যাস। এই কাঁচের ঘনত্ব এমন যা এক্স-রশ্মি ভেদ করে যেতে পারে। আর সেপারেটর-এর কাঁচ হলো লেড ক্রিস্টাল। যার মধ্যে ২৫ শতাংশ লেড বা সীসা থাকে। বর্তমানে লেড-এর ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে বাঁচতে, লেডের পরিবর্তে বেরিয়াম সালফেট মেশানো হয়। এই কৃত্রিম কাঁচের ঘনত্ব এত বেশি যে তার মধ্য দিয়ে এক্স-রশ্মি ভেদ করে যেতে পারে না।

(২)

মহাশয়,

আমি বিজ্ঞানমনস্ক'র মুখপত্র – সমীক্ষণ-এর একজন নিয়মিত গ্রাহক। যেহেতু আমি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র সেহেতু এই পত্রিকার গুরুত্ব আমার কাছে অবর্ণনীয় ও অপরিসীম। সুকুমার রায় রচনাসমগ্র'র বিজ্ঞানমূলক গল্প পড়তে গিয়ে আমার মনে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয়। প্রশ্নটি হল – বিভিন্ন রসায়নের/ পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বোতল থেকে বায়ু বের করে নেওয়া হয়, তাহলে কাঁচের বোতলটি বাইরের বাতাসের চাপে ফেটে যায় না কেন?

৬.১০.২০১৮ ভাস্কর মিস্ত্রী
গোয়ালবেড়িয়া, শ্রীকৃষ্ণনগর
দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সম্পাদকের উত্তর ঃ

প্রিয় পাঠক ভাস্করবাবু,

আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে বলি – পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অবস্থিত কোনো ফাঁপা বস্তু (যেমন মুখ বন্ধ কাঁচের বোতল) যা আমরা সাধারণভাবে ফাঁকা বা খালি ভাবি তা আসলে বায়ুপূর্ণ। এই রকম ফাঁকা বস্তুর ভিতরে বায়ুর চাপ এবং বাইরের বায়ুর চাপ একে অপরকে প্রশমিত করে বলেই বস্তুটির আকার নির্দিষ্ট থাকে। এইরূপ আপাত ফাঁকা বস্তু থেকে বায়ুনিরুদ্ধভাবে, বায়ুনিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে বায়ু বাইরে বার করতে থাকলে, ভিতরে বায়ুর চাপ কমতে থাকবে। স্বাভাবিকভাবেই ঐ ফাঁপা বস্তুর ভিতরটি যদি সত্যিই সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা যায় তবে বাইরের বায়ুর চাপে বস্তুটি তুবড়ে বা চেপ্টে (অথবা ভেঙে) যাবে। যদি ভিতরের চাপ বাইরের চাপের অনেক বেশি হয় তবে ফেটে যাবে। কিন্তু ফাঁপা বস্তুর ভিতরে ও বাইরে চাপ ভিন্ন হলে বস্তুটির আকার-আকৃতির পরিবর্তন কিরূপ হবে তা নির্ভর করে বস্তুর উপাদানের উপর।

এবার মনে হয় উত্তর খোঁজাটা সহজ হবে। প্রথমত উল্লিখিত পরীক্ষাগুলিতে, পরীক্ষাপাত্রগুলিকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা হয়েছিল এমনটা বলা হয়নি। তথাপি বলা হোক আর না হোক সত্যিই যদি পরীক্ষাপাত্রগুলিকে (কাঁচের বোতল) সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা হতো তবে তা বাইরের বায়ুর চাপে ভেঙে যেতো। বায়ু নিষ্কাশনের পরেও পরীক্ষা পাত্রগুলি ভাঙেনি কারণ পাত্রগুলিকে সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা হয়নি। সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করাও সম্ভব নয়।

এবার আরও একটা বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন। তড়িৎমোক্ষণ নলের ঘটনাবলী লক্ষ করলেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

আবার আংশিক তরলপূর্ণ পাত্র থেকে বায়ু নিষ্কাশন করলে, পাত্রের তরলের বাষ্প দ্বারা ঐ অংশ পূর্ণ হয়। ফলে পাত্রের ভিতরে ঐ পদার্থের বাষ্প চাপ এবং পাত্রের বাইরে বায়ুর চাপ একে অপরকে প্রশমিত করে। যেমন টরিসেলির পরীক্ষায় যা টরিসেলির শূন্যস্থান

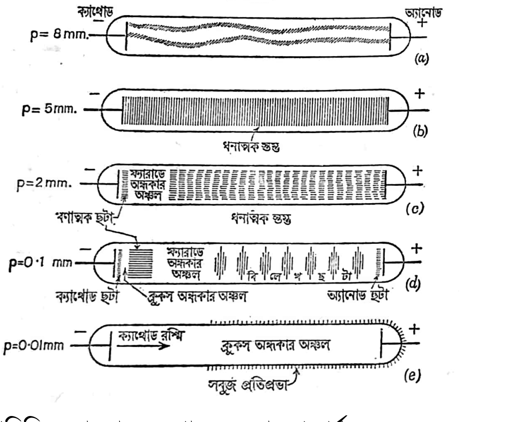

রূপে পরিচিত তা আসলে পারদের বাষ্পে পূর্ণ।

এই কারণে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে বায়ুশূন্য না বলে, প্রায় বায়ুশূন্য বলাই ভালো। ■

পাঠকের কলাম ঃ

অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রচার করে কারা?

– রঞ্জিত চক্রবর্তী, পুরুলিয়া

বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে সৃষ্টি হওয়া বিপর্যয় – যেমন বেকারী-দারিদ্র-মূল্যবৃদ্ধি ছাঁটাই-মজুরী হ্রাস-লক আউট থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিবহন প্রতিটি ক্ষেত্রে আকাশছোঁয়া ব্যয় বৃদ্ধি, যুদ্ধবিগ্রহ থেকে সন্ত্রাসী আক্রমণ, লুঠতরাজ থেকে ব্যাঙ্কে লালবাতি – সাধারণ মানুষকে অদৃষ্ট নির্ভর, অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে।

কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী প্রয়োগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অলৌকিতা আর অদৃষ্টনির্ভরতা নেহাতই ঠুনকো হয়ে দাঁড়ায় প্রতিটি পদক্ষেপে। তাই নিরন্তর অলৌকিকতাবাদী-অবৈজ্ঞানিক প্রচার চালিয়ে যেতে হয়। রেডিও-টেলিভিশনে আলোচনা সভা-বিজ্ঞাপন ছাড়াও প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি এবিষয়ে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলা ভাষার 'অগ্রগতি'র ধারক আনন্দবাজার ২৫শে অক্টোবর অনলাইন সংস্করণে 'জ্যোতিষকথা' বিভাগে রচনা প্রকাশ করে জানাচ্ছে –

জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে নটি গ্রহের প্রত্যেকটি গ্রহ এক একটি রোগের কারক।... এই সমস্ত গ্রহ যখন অশুভ অবস্থায় থাকে তখন স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। রচনায় শরীর সুস্থ রাখার জন্য হরেক রকম উপায় বাতলানো হয়েছে। যার দু একটা নিম্নপ্রকার ঃ

দীর্ঘকালীন রোগ থাকলে ছোট শঙ্খের ভিতর সন্ধক লবন পুরে সেটা রোগীর বিছানার নীচে রাখতে হবে।

মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ, দেহরক্ষা কবচ ধারণ করা যেতে পারে।

রত্ন সহকারে গ্রহের প্রতিকার করলেও উপকার পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ অত্যন্ত গোদা শব্দে কু-সংস্কার ও কারবারকে একসাথে পরিবেশন করা হয়েছে।

গত ২৭শে জুলাই ২০১৮ বিজ্ঞানী-বিজ্ঞানকর্মী-বিজ্ঞানমনস্ক এবং সাধারণ মানুষ গভীর উৎসুক্যের সাথে শতাব্দীর দীর্ঘতম চন্দ্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছেন সমগ্র দুনিয়া জুড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বুঝতে চেয়েছেন লোহিত বর্ণের চাঁদ (BLOOD MOON) দেখতে পাবার কারণ কী।

অথচ দেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রগুলি বিভিন্ন অন্ধবিশ্বাসমূলক আর ছদ্মবৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার ভরপুর প্রচেষ্টা রেখেছে। কয়েকটা উদাহরণ নিম্নপ্রকার ঃ–

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস (২৭শে জুলাই) এক নিবন্ধে এক চিকিৎসক মহাশয় হাওয়ালা দিয়ে বলছে – 'গ্রহণের সময় গর্ভবতী মহিলাদের মেনে চলার মত কিছু রীতি ও বিশ্বাস বহু দিন ধরে চলে আসছে। প্রাচীন অধ্যয়ণ অনুযায়ী দেখা গেছে এ সময় ওজোনের (O_3) গাঢ়ত্ব অনেক কমে যায় এবং অতি বেগুনি রশ্মি দুঘণ্টা পর্যন্ত সময়কালে বেড়ে যায় তাই খাদ্যগ্রহণের জন্য বিশ্বাসীদের কাছে পরামর্শ হল –

* হাল্কা সহজপাচ্য খাবার গ্রহণের দুঘণ্টা আগে খান এবং

আবার খাবার গ্রহণের জন্য গ্রহণের দুঘন্টা পর পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

* খাবারে হলুদ যোগ করুন এর জীবাণুনাশক গুণের জন্য।

* গ্রহণের দিন আমিষ খাবার খাবেন না কারণ এটা পরিপাক করতে অনেক সময় লাগে।

* হবু মা রা শুকনো ফল খান। শক্তিবর্দ্ধন করবে।

* দুঘন্টা আগে অনেক জল খান। গ্রহণকালে জল খেতে হলে ফুটানো জল ঠান্ডা করে খান। তার মধ্যে তুলসীর আরক দিলে ভাল যা ভাইরাস নাশক ও সংক্রমণ এড়াতে কাজে লাগবে।

* গ্রহণের আগে রান্না করা খাবার ফেলে দিন। কারণ ক্ষতিকারক বিকিরণ গ্রহণের সময় খাবারের দ্বারা শোষিত হতে পারে।

* দূর্বা ঘাস দ্বারা রেখে দেওয়া খাবার সংরক্ষণ করা যায়। ক্ষতিকর রাসায়নিক সংরক্ষকের থেকে এটা অনেক ভাল।

গ্রহণ হল ধ্যান ও প্রার্থনার জন্য পবিত্র সময়। এটা দেখা গেছে সংস্কৃত মন্ত্র [রবিশংকর এর 'আর্ট অব লিভিং' থেকে অর্জিত জ্ঞান, পরামর্শগুলির ক্ষেত্রে গৃহিত হয়েছে] আওড়ালে মস্তিষ্কের জ্ঞান সম্বন্ধীয় অংশগুলি আকারে বৃদ্ধি পায়।

হিন্দুস্তান টাইমস চন্দ্রগ্রহণের কারণ দুলাইন লিখে এ সম্পর্কে দশটি 'মিথ' ও **'তথ্য'** (fact) তুলে ধরেছে। যার দুটো হল এরকম – এটা দেখা গেছে যে ২৮ দিনের পূর্ণচন্দ্র পরিক্রমায় যে ভৌত পরিবর্তন হয় গ্রহণের সময় মাত্র ৩ ঘন্টায় সেটা হয়ে যায়। এই অসাধারণ পরিবর্তন জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটিয়ে খাবারের গুণ নষ্ট করে দেয়, তাই গ্রহণের সয় না খাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

চন্দ্রগ্রহণ কি মানুষের অবসাদ, ক্লান্তি, উদ্বেগ বা মেজাজের পরিবর্তন জনিত মানসিক সমস্যাগুলো বৃদ্ধি করে? হ্যাঁ চন্দ্রগ্রহণের সময় মানুষের এই আবেগগুলো অনুভূত হতে পারে। কিন্তু এজন্য চন্দ্রগ্রহণ দায়ী নয়! চাঁদ হল সৃষ্টিশীলতার সাথে সংযুক্ত ... চন্দ্রগ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্ধকার মানুষের মনে এই নেতিবাচক আবেগগুলো বাড়িয়ে দিতে পারে।

টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া বলছে চন্দ্রগ্রহণের নয় ঘন্টা আগে রান্না করা খাবার খাওয়া উচিৎ নয়। গর্ভবতী মহিলাদের ঘরের বাইরে না যাবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বাচ্চার উপর যাতে ক্ষতিকর প্রভাব না পড়ে।

এগুলো হল কয়েকটি মাত্র উদাহরণ যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে টিকিয়ে রাখার কী গুরুতর দায়িত্ব সুপরিকল্পিতভাবে পালন করছে এই সংবাদপত্রগুলির মালিক গোষ্ঠীসমূহ। কারণ বেশিরভাগ সংবাদপত্রে যোগ-আয়ুর্বেদ-প্রাচীন অধ্যয়নের উদাহরণ দিয়ে একই বক্তব্য প্রচার করা হয়েছে।

অন্যদিকে 'অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া' সহ বহু বিজ্ঞান সংস্থা-সংগঠন এই সমস্ত বুজরুকী প্রচারের বিরোধিতা করেছেন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে।

যেমন 'অ্যাস্ট্রোনমি আউটরীচ' লিখেছে 'মিথ্যায় পরিপূর্ণ একটি নিবন্ধ আর সেই মিথ্যার বিরুদ্ধে উদ্ধৃতি প্রচার করা নীতিনিষ্ঠ সাংবাদিকতা হতে পারেনা। ... আপনি গ্রহণের সময় যা খুশী খেতে বা পান করতে পারেন। যেমন স্বাভাবিকভাবে করে থাকেন। কিছুই পরিবর্তন হয় না কেবল কিছু আলোকরশ্মি আকাশে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মাত্র।

গ্রহণে কোন ক্ষতিকর বিকিরণ সৃষ্টি হয় না। যদি আপনার ছায়া মাটিতে পড়ে তাহলে আপনি কোন ক্ষতিকর বিকিরণ নির্গত করেন না, এও তাই! ■

গ্রহণ ঃ গ্রহ-উপগ্রহে আলো-ছায়ার খেলা

সৌর জগতে আলোর উৎস সূর্য। আলো তার চলার পথে বাধা পেলে ছায়ার উৎপত্তি হয়। ছায়ার বিষয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা বহু পুরানো। ঘড়ি আবিষ্কারের বহুপূর্বে খুঁটির ছায়ার দৈর্ঘ্য দেখে-মেপে সময় গণনা করা হতো। আলোক উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তুর আপেক্ষিক আকৃতির ওপর নির্ভর করে ছায়ার প্রকৃতি। সুতরাং ছায়া সৃষ্টির বা উৎপত্তির জন্য প্রয়োজন হলো আলোক উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তু। আর ছায়া প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রয়োজন হলো ক্ষেত্র বা পর্দা যেখানে আলোক উৎসের আলো পৌঁছাতে পারে না অস্বচ্ছ বস্তুর বাধায়।

সৌর জগতে সূর্যের আলো যখন পৃথিবীতে বাধা পায় তখন যে ছায়ার সৃষ্টি হয় তা যদি চাঁদের ওপর পরে, তবেই চাঁদের গ্রহণ হয়। চন্দ্র গ্রহণে পৃথিবীর ছায়া চাঁদের ওপর দেখি। আবার সূর্যের আলো যখন চাঁদের বাধা পায় তখন যে ছায়া উৎপন্ন হয় তা যদি পৃথিবীতে পড়ে, তবেই সূর্যের গ্রহণ হয়। সূর্যগ্রহণে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পরে।

আগেই বলেছি ছায়ার প্রকৃতি নির্ভর করে আলোক উৎস এবং অস্বচ্ছ বস্তুর আকৃতির উপর। গ্রহণের ক্ষেত্রে আলোক উৎস সূর্য আকারে পৃথিবী ও চাঁদ অপেক্ষা বহুগুণ বড়। আবার আলোক উৎস অনেক বড় হলে, অস্বচ্ছ বস্তু ও ছায়া প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্র বা পর্দার মধ্যে দূরত্বের ওপর ছায়ার প্রকৃতি নির্ভর করে। যেমন দিনের বেলায় কোন পাখি যখন ভূপৃষ্ঠের (মাটির) কাছ দিয়ে উড়ে যায় তখন তার ছায়া মাটিতে পরে কিন্তু অনেক ওপরে উঠে গেলে তার ছায়া আর দেখা যায় না। উড়োজাহাজ ওড়ার সময় একই ঘটনা দেখা যায়।

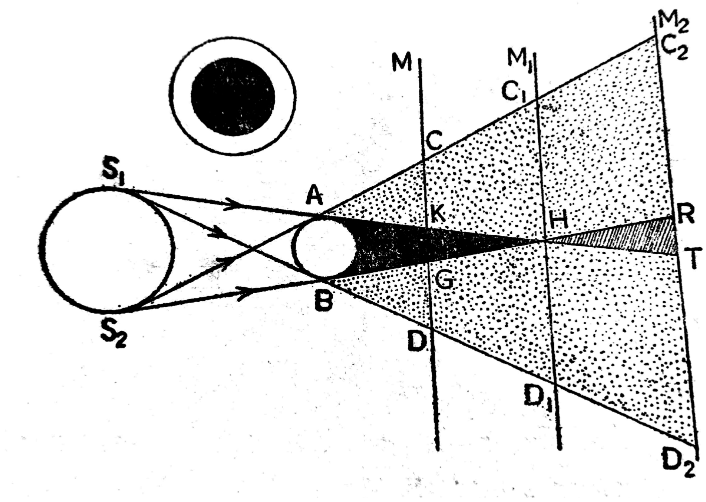

এখন বিস্তৃত আলোক উৎস ও ক্ষুদ্রতর অস্বচ্ছ বস্তুর ক্ষেত্রে ছায়ার প্রকৃতি কেমন হবে তা দেখা যাক।

আলোক উৎসের S_1 বিন্দু থেকে আলো অস্বচ্ছ বস্তুর A বিন্দুতে স্পর্শ করে S_1A পথে সোজা চলে গেছে। আবার S_2 বিন্দু থেকে আলো, অস্বচ্ছ বস্তুর A বিন্দু স্পর্শ করে S_2A পথে সোজা চলে গেছে।

পর্দার M অবস্থানে CK অংশে S_1 বিন্দু থেকে কিছু আলো পৌঁছালেও S_2 বিন্দু থেকে কোন আলো পৌঁছায়নি। অনুরূপে GD অংশে S_2 বিন্দু থেকে কিছু আলো পৌঁছালেও S_1 বিন্দু থেকে কোন আলো পৌঁছায় নি। কিন্তু KG অংশে S_1 ও S_2 এর মধ্যবর্তী কোন বিন্দু থেকেই কোন আলো পৌঁছাতে পারেনি।

পর্দার M অবস্থানে যে ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে তার KG অংশকে প্রচ্ছায়া বলা হয়। আর KC ও GD অংশকে উপচ্ছায়া বলা হয়। পর্দার M_1 অবস্থানে প্রচ্ছায়া বিন্দুবৎ এবং M_2 অবস্থানে প্রচ্ছায়া পাওয়া যায় না। কিন্তু RT অংশ থেকে আলোক উৎসের দিকে তাকালে AB অস্বচ্ছ বস্তুকে আলোক-এর মধ্যে অন্ধকার দেখাবে। পর্দার অবস্থান অস্বচ্ছ বস্তু থেকে আরও দূরবর্তী হলে উপচ্ছায়ার গাঢ়ত্ব কমে যাবে এবং এক সময় আলো-ছায়ার পার্থক্য থাকবে না।

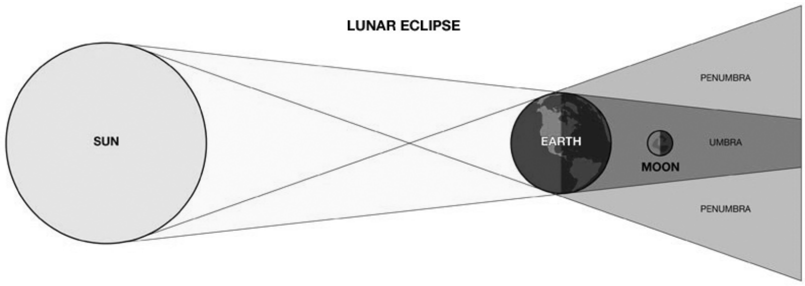

চন্দ্রগ্রহণ

কোন পূর্ণিমার রাতে, নিজের নিজের কক্ষপথে গতিশীল অবস্থানে চাঁদ ও সূর্যের মধ্যবর্তী কোন স্থানে পৃথিবী যদি এমনভাবে উপস্থিত হয় যে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরলরেখায় অবস্থান করে, যার ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে বাধা পায় আর পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে, এই ঘটনাকেই চন্দ্র গ্রহণ করা হয়।

চাঁদ পৃথিবীর প্রচ্ছায়া অংশে প্রবেশ করলে চাঁদের পূর্ণ গ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়। আবার যখন চাঁদের কিছুটা অংশ পৃথিবীর প্রচ্ছায়া এবং কিছুটা অংশ পৃথিবীর উপচ্ছায়ায় থাকে তখন চাঁদের খন্ড গ্রহণ হয়।

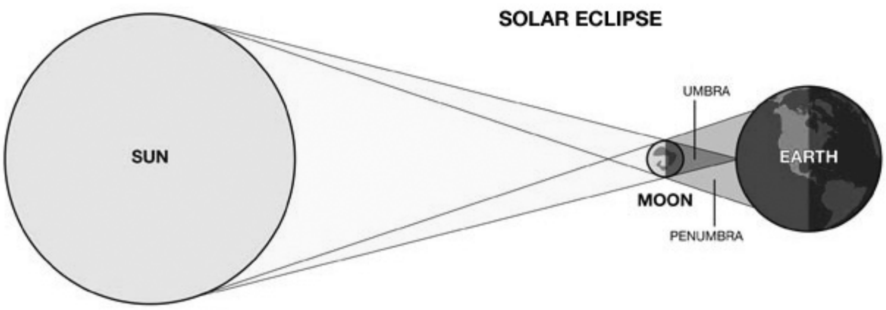

সূর্যগ্রহণ

কোন অমাবস্যার দিনে, নিজের নিজের কক্ষপথে গতিশীল অবস্থায় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চাঁদ যদি এমনভাবে উপস্থিত হয় যে সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে, ফলে সূর্যের আলো চাঁদে বাধা পায়, চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপর পড়ে, এই ঘটনাকে সূর্যগ্রহণ বলা হয়।

চাঁদ আকারে পৃথিবীর থেকে ছোট হওয়ার, চাঁদের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর যে অংশে, সেই অংশের লোক সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখতে পায়। আর যে অংশের লোকের কাছে চাঁদের শুধু উপচ্ছায়া তারা খন্ড গ্রহণ দেখতে পায়।

আবার অনেক সময়, পৃথিবী ও চাঁদের আপেক্ষিক দূরত্ব এমন হয় যে সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী এক সরলরেখায় অবস্থান করলেও চাঁদের প্রচ্ছায়া পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় না। কিন্তু প্রচ্ছায়া অংশের বিপরীতে অপসারি শঙ্কুর মধ্যে পৃথিবীর যে অংশ পড়ে সেই অংশের লোকে সূর্যের বলয় গ্রহণ দেখে।

পৃথিবী ও চাঁদের কক্ষতলের পার্থক্য ৫°। ফলে প্রত্যেক অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় সূর্য-পৃথিবী-চাঁদ একই সরল রেখায় অবস্থান করতে পারে না।

সূর্য থেকে যে শক্তি পৃথিবীতে পৌঁছায় তার একটা অংশ **দৃশ্যমান** (আলোক রশ্মি), আর একটা অংশ হলো **অদৃশ্যমান**। এই অদৃশ্যমান রশ্মি দুই প্রকার – ১) অবলোহিত রশ্মি ও ২) অতিবেগুনি রশ্মি।

সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকালে অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের চোখের কর্ণিয়া ও রেটিনাকে নষ্ট করে। তাই খন্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ বা সূর্যের বলয় গ্রহণ খালি চোখে দেখার সময় সূর্য থেকে বিকিরিত এই অতিবেগুনি রশ্মি আমাদের চোখে পৌঁছে চোখের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে সূর্য দেখার জন্য চোখের ক্ষতি হলে তার কারণ সূর্যগ্রহণ নয়। কারণ হলো সূর্য থেকে নির্গত অতিবেগুনি রশ্মি যা গ্রহণ ছাড়া অন্য সময়ও চোখের অনুরূপ ক্ষতিই করে। বরঞ্চ পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ চলাকালীন সময়ে সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকানো সবচেয়ে নিরাপদ কারণ ঐ সময় সূর্য থেকে সরাসরি কোন রশ্মি আমাদের চোখে পৌঁছায় না। চাঁদ কোন রশ্মি বিকিরণ করে না, সৌর রশ্মিকে প্রতিবিম্বিত করে মাত্র। এই প্রতিফলিত রশ্মির তীব্রতা খুবই কম। তাই চন্দ্রগহণ খালি চোখে দেখার বিষয়ে কোনো সমস্যা নেই।

সৌরজগতে পৃথিবী ও চাঁদ ছাড়াও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহদের মধ্যে গ্রহণ দেখা যায়। আসলে গ্রহণ হলো সৌরজতে গ্রহ-উপগ্রহে আলো-ছায়ার খেলা।■

যে সব স্টলে পত্রিকা পাওয়া যাচ্ছে

* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের মণিষা বুক স্টল
* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের বইচিত্র বুক স্টল
* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের বুক মার্ক
* কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের পিপলস বুক সোসাইটি
* সোনারপুর স্টেশনের বুক স্টল ২ নং প্ল্যাটফর্ম
* বারুইপুর স্টেশনের বুক স্টল
* পাথর প্রতিমা বাজারের বুক স্টল
* আসানসোল কোর্ট মোড়ের বুক স্টল
* শিলিগুড়ি সেবক মোড়ের পত্রিকা স্টল
* শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে বাস স্ট্যান্ডের বিপরীতে বিদিশা পেপার হাউস
* নবদ্বীপ পোড়ামাতলা বাজারের বুক স্টল

গল্প ঃ

পূর্ণিমাতে ঘোর অমাবস্যা

– অসীম হালদার

সেদিন সন্ধে বেলা অফিস থেকে ফিরে হাত পা ধুয়ে সবে মুড়ি চানাচুর নিয়ে বসেছি। এমন সময় কলিং বেলের আওয়াজ। দরজা খুলে দেখি পটলা আর ছোটন এসেছে। বললাম, কী ব্যাপার, কিছু খবর আছে? ভেতরে এসো। একটু চা, মুড়ি-চানাচুর খাও। খেতে খেতে বলো। কিন্তু তর না দিয়ে ছোটনই কথাটা পাড়ল। বলল বিল্টুদা, আমরা ঠিক করেছি আগামীকাল সবাই মিলে, মানে পাঁচজনে, সন্ধে বেলা বিচালিঘাট থেকে একটা নৌকা ভাড়া করে চেঙ্গাইলের শরৎপল্লীতে যাবো। আমি বললাম, পাঁচজনে মানে কে কে, আর শরৎপল্লীতেই বা কেন? সেখানে কী আছে? আর সন্ধে রাত্তিরেই বা কেন? এবারে পটলা ব্যাপারটা খোলসা করল। বললে, বিল্টুদা, তুমি, আমি, ছোটন, শ্রেয়া আর নন্দিতা আমাদের পাড়ার এই পাঁচজনে যাবো। সবাই রাজী আছে, এখন তুমি হ্যাঁ বললেই হয়। ওখানে শ্রেয়ার পিসির বাড়ী। একেবারে গঙ্গার ধারে বলা যায়। গ্রাম্য পরিবেশ। এক রাত এক দিনের জন্যে বেশ ভালো লাগবে। আমি বললাম – একে তো শ্রাবণ মাস, যখন তখন বৃষ্টি নামতে পারে। তার উপরে সন্ধের পরে যাওয়াটা কি ভালো হবে? এবার ছোটন বললো, বিল্টুদা, তুমি ভুলে গেলে কাল কী দিন! কাল যে গুরুপূর্ণিমা। আমি বললাম, তোরা সব নাম ডাক ওয়ালা বিজ্ঞান সংগঠনের সদস্য হয়ে এসব গুরু টুরু কী বলছিস? গুরুপূর্ণিমা তো তোর কী? এবার পটলা গম্ভীর ভাবে খানিকটা বিজ্ঞের মতো বললো, কালকের রাতটার বিশেষত্ব গুরু পূর্ণিমায় নয়। আগামীকাল রাত্রে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ এবং ভারতে দৃশ্য। সব জায়গা থেকেই এই গ্রহণ দেখা যাবে। আর একটা সুখবর, আবহাওয়া অফিস বলেছে আগামী দু'তিন দিন খুব একটা বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। হয়ত মাঝে মাঝে টুকরো মেঘে সাময়িক ভাবে চাঁদ ঢাকা পড়তে পারে। তবে আকাশ জোড়া মেঘ থাকবে না। এবার বলো, আমরা এই চান্সটা নিতে পারি কি না! শ্রেয়া তো তার পিসির সঙ্গে কথাও বলে রেখেছে। আমি বললাম, বেশ, যাওয়া যেতে পারে। তবে ওর পিসিকে বলে দাও আমরা কাল রাত্রে 'পিকনিক' করতে যাচ্ছি, তাই আমাদের জন্যে রান্না-বাড়ার কোন ঝামেলা নেবার দরকার নেই। পারলে আমাদের সঙ্গে ওনারাও যোগ দিলে ভালো হয়। ছোটন বললো, ওনার মেয়েটাতো এখন বাপের বাড়ী এসেছে বলে শুনলাম, ভালোই হবে। ওকে আমাদের পিকনিকের দলে নিতে হবে। তা'হলে ওই কথাই রইলো। তোমার ঘরে আমরা সবাই কাল সন্ধে সাড়ে ছ'টায় জড়ো হচ্ছি। তুমি হলে আমাদের লীডার। এই বলে দু'জনে হন্ত দন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। চা, মুড়ি-চানাচুর ডিউ রইল।

পরের দিন, ২৭শে জুলাই, শুক্রবার, সন্ধে ছ'টার সময়ই সবাই এসে হাজির। সবাই যেন উত্তেজনায় কাঁপছে। ছোটন এর হাতে এস এল আর ক্যামেরা, পটলার হাতে একটা দূরবীন। নন্দিতা আর শ্রেয়া শুধু মোবাইল নিয়েছে সঙ্গে। আমি নিলাম আমার ক্যামেরা আর টুকিটাকি কিছু জিনিস। আর সেই সঙ্গে ভিজে ছোলা তেলে ভেজে মুড়ির সঙ্গে মাখিয়ে একটা বড়ো ঠোঙায় ভরে নিলাম। নৌকায় বসে খাওয়া যাবে বলে। পটলা আগে থেকে নৌকা 'বুক' করে রেখেছিলো। আমরা সবাই মিলে নৌকায় গিয়ে বসলাম। নৌকা ছেড়ে দিলো। 'দুগ্গা-দুগ্গা' কেউ বললো না। বরং সবাই মিলে কোরাসে গান ধরলো –

...জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে সকল-অনাসৃষ্টি,
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি, রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকা ভাসা, রাখি নে, ভাই, ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি ভেসেই চলা বই।
ভালো মানুষ নই রে মোরা ভালো মানুষ নই।...

নৌকা ভেসে চলেছে বাঁদিকের পাড় থেকে ক্রমশঃ ডান দিকের 'কোম্পানীর বাগানের' গা ঘেঁষে দক্ষিণ মুখে। পশ্চিম দিকে একটু আগে বড় থালার মতো লাল সূর্য্যটা অস্তে গিয়েছে। পূব দিকে দিগন্ত থেকে ধীরে ধীরে বড় থালার মতো সাদাটে চাঁদ উপর দিকে উঠছে। দুই পাড়ে বিদ্যুতের খুটিগুলোতে আলো জ্বলছে। জলের মধ্যে সেই আলোর ছায়া পড়ে ঝিলমিল করছে। দূরে দু'একটা জাহাজ কি স্টীমার দেখা যাচ্ছে। তারা আসছে, না যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে না। দু'একটা খড় বোঝাই নৌকা বিচালি ঘাটের দিকে ভিড়তে চলেছে। রাতের এই দৃশ্য দেখে রোমাঞ্চ লাগছে। সবে আমি আবেগের বশে আবৃত্তি করতে শুরু করেছি –

আর কতো দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী
বলো কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী...

অমনি একেবারে রস-ভঙ্গ করে নন্দিতা বলে উঠল – আপাতত নিয়ে চলেছে চেঙ্গাইলের শরৎপল্লী। বলে ফিক করে হেসে উঠলো। সবাই সে হাসিতে যোগ দিলো। এইভাবে আমরা সবাই হাসি ঠাট্টা গান আবৃত্তি করতে করতে, কখন নৌকা এসে ভিড়লো শরৎপল্লীর বাঁধানো ঘাটে বুঝতেই পারিনি! মাঝির পয়সা মিটিয়ে দিয়ে আমরা নিজেদের মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। আমাদের

সঙ্গে মোবাইলে কথা বলে পিসেমশাই আগে থেকেই ঘাটে এসে বসেছিলেন। উনি আমাদের সবাইকে কাছেই ওনাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন রাত্তির প্রায় দশটা বাজে। পিসিমা বললেন তোমরা দেরী কোরো না। তাড়াতাড়ি হাত-পা ধুয়ে খেয়ে নেবে এসো। একটু পরেই তো গ্রহণ লেগে যাবে। আমরা বললাম, সে হয় না পিসিমা। আমরা এই নদীর পাড়েই ঘাটের কাছে যে বটগাছটা আছে তারই নীচে পিকনিক করবো, রান্না করে খাবো। পিসিমা প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, ওমা, সে কি গো! এখন তোমরা কখন রাঁধবে, আর কখন খাবে! পঞ্জিকাতে বলেছে রাত্তির ১১টা ৫৪ মিনিটে 'গ্রহণ' শুরু হয়ে যাবে। তখন আর খাওয়া যাবে না, সব ফেলা যাবে! শ্রেয়া বললো, পিসিমা আমাদের কিছু হবে না। আমরা খোলা আকাশের নীচে 'গ্রহণ' দেখতে দেখতেই রান্না খাওয়া করবো। ছবিও তুলবো। পিসিমা বললেন, যদি একান্তই তোমরা কথা না শোন, তা হলে উপায় একটা করে দিচ্ছি। গোয়াল থেকে কিছুটা গোবর আর উঠোন থেকে তুলসী পাতা এনে দিচ্ছি। এগুলো প্রত্যেকটা খাবারের পাত্রের ঢাকনার ওপর একটু রেখে দিও। 'দোষ' কেটে যাবে। শুনে পটলাটা কিছু বলতে যাচ্ছিল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম পিসিমার এই দীর্ঘদিনের বিশ্বাসে আঘাত দেওয়া ঠিক হবে না। পটলাকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, পিসিমা, আমার কাছে এই তুলসী পাতা আর গোবরের মতই গুণসম্পন্ন অন্য একটি ভালো জিনিস আছে। এটা আমার খুড়তুতো ভাই আমেরিকা থেকে ১৫০০ ডলার দিয়ে এনে দিয়েছে। এটা ও দেশের 'চন্দ্রমণি', আর কি! এটা যার কাছে থাকবে শুধু তাকে কেন, তার বাড়ীর ত্রিসীমানায় চন্দ্রগ্রহণ কোন রকম দাঁত ফোটাতে পারবে না। আমরা তো এর আগে কত খন্ডগ্রাস, পূর্ণগ্রাস চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ দেখে এসেছি। কোনও 'দোষ' লাগে নি আমাদের। দেখবেন সেটা? বলেই পকেট থেকে একটা মাঝারি সাইজের কাঁচের নকল হীরের টুকরো বের করে পিসিমাকে দেখালাম। পিসিমা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে সেটাকে নেড়ে চেড়ে দেখলেন। শেষে বললেন, তোমার খুড়তুতো ভাইকে বোলো তো আমার জন্যে একটা এনে দিতে। আমি পয়সা দিয়ে দেবো! এদেশে সব ঠগ জোচ্চোরের কারবার। যাইহোক, পিসিমাকে ম্যানেজ করে আমরা নদীর পাড়ে সেই বটগাছের নীচে গেলাম।

ছোটন ফুলেশ্বরের বাজার থেকে স্টোভ, হাঁড়ি, কড়াই, বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। ছোটনের ফোন পেয়ে একজন লোক এসে সে সব পৌঁছে দিয়ে গেল। কাছেই একটা টিউবওয়েল থেকে জল আনা গেল। রাত সোয়া বারোটার মধ্যে আমাদের রান্না শেষ।

'গ্রহণ' লেগে গেল ঠিক ১১টা ৫৪ মিনিটে। আস্তে আস্তে চাঁদ ছোট হতে লাগলো। আমাদের ক্যামেরায় পটাপট ছবি উঠতে লাগলো। রাত্তির ঠিক একটায় শুরু হবে পূর্ণগ্রাস। থাকবে রাত ২টা ৪৪মিঃ পর্যন্ত। আমরা একবার ভাবলাম, পিসির যে মেয়েটা, পুটু তার নাম, সে তো ৫ মাসের অন্তঃসত্তা। সে নিশ্চয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তবু দেখি একবার। আমরা সবাই খাবো, আর ওকে একবার ডাকবো না! এই ভেবে আমি আর শ্রেয়া ঘরের দিকে এগিয়ে এলাম। দেখি বারান্দায় আলো জ্বলছে। আর পুটু একা একা সেখানে পায়চারী করছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার, তুমি একা একা কী করছ? ঘুমাও নি কেন? সে বললো, মা বলেছে এই সময় অন্তঃসত্ত্বা মেয়েদের ঘুমাতে নেই। আমার পেটে তো বাচ্চা আছে। এদিকে বসলেই তো ঘুম পাচ্ছে। তাই ঘর আর বারান্দায় পায়চারী করছি। এবার আমাকে আবার মিথ্যের আশ্রয় নিতে হলো। বললাম, চিন্তা কোরো না। এই 'চন্দ্রমণি' পাথরটা তুমি আজ রাত্তিতে রাখো তোমার হাতে বা বালিসের নীচে। দেখবে তোমার কোনো 'দোষ' লাগবে না। আমেরিকার চন্দ্রমণি বলে কথা! খুব পাওয়ারফুল। এমন কি এটা হাতে নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে গঙ্গার ধারে ঘুরেও আসতে পারো। পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণও দেখতে পারো। কোনো ক্ষতি হবে না। আর শোনো, তোমাকে রাত জাগতেও হবে না। চাঁদের দিকে তাকিয়ে একবার পূর্ণগ্রাস অবস্থা দেখার সাধ মিটিয়ে নিয়ো। তারপর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়। শরীরকে কষ্ট দিও না। দেখবে তোমার কোন 'দোষ' তো লাগবেই না, উল্টে তোমার ও তোমার ভাবী সন্তানের চেহারায় পূর্ণিমার চাঁদের মতো কান্তি দেখা দেবে। এবার মনে হোল পুটু কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছে। হতেই হবে। আমেরিকা থেকে আনা হীরের টুকরো পাথর কিনা! এর কত শক্তি! পুটু তার হাতে আমার নকল (কাঁচের) হীরে ধরে একবার আকাশের দিকে তাকালো। চাঁদ তখন পুরোপুরি পৃথিবীর প্রচ্ছায়ার মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে। যেন ঘোর অমাবস্যা। কী অদ্ভুত লাগছে! আমাদের রান্না খাবার একটু তাকে চেখে দেখতে দিলাম। সে নিশ্চিন্তে চেখে দেখল। তারপর ঘরে এসে নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এবং অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল হলে আমরা পিসিমাকে বললাম, পিসিমা, কালকের সেই তোমার রান্না করা বাড়তি খাবারগুলো দাও তো দেখি! আমরা ও গুলো দিয়ে আজ ব্রেকফাস্ট করবো। তারপর সোজা উলুবেড়িয়া লোকাল ধরে কোলকাতা। মনে রাখবেন, আমাদের কিচ্ছু হবে না, আমেরিকান 'চন্দ্রমণি'। খুব পাওয়ারফুল! পুটু ঘুম থেকে একটু দেরী করে উঠে বললো, রাতে দারুণ ঘুম হয়েছে। বেশ সুস্থ লাগছে।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। এই নভেম্বরের ৫ তারিখে পুটুর একটা ফুটফুটে চাঁদের কণার মতো পুত্রসন্তান হয়েছে। সেদিনের সেই মনরক্ষাকারী চিকিৎসা বা Placelo treatment বেশ কাজে লেগেছে বলতে হবে! ■

ঃ বিজ্ঞানের খবর ঃ

জুলাই ২০১৮

২রা জুলাই ঃ ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেশান এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি সদ্যজাত গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন, তার নাম দেওয়া হয়েছে পিডিএস ৭০বি, এটি জুপিটার এর থেকে অনেক গুণ বড় একটি গ্রহ। তথ্যসূত্র – ইউরোপিয়ান সাউদার্ন অবজারভেশান।

১১ই জুলাই ঃ চীনের প্রত্নতত্ত্ববিদরা পৃথিবীর সবচাইতে পুরানো পাথর নির্মিত যন্ত্রের সন্ধান পেয়েছেন, এই যন্ত্রটি আনুমানিক ২১ লক্ষ বছরের পুরানো। তথ্যসূত্র – দা নিউইয়র্ক টাইমস

১২ই জুলাই ঃ নাসার হাবল আর ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি'র গাইয়া মিলে মহাবিশ্বের বৃদ্ধির মাত্রা পরিমাপ করেছেন। এর মান হল ৭৩.৫/সেকেন্ড/ম্যাগনা সেকেন্ড। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি।

১৭ই জুলাই ঃ ওয়াশিংটন এর কারনেজ ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এর বিজ্ঞানী স্কট এস শেপার্ড এর নেতৃত্বে একটি গবেষকদের দল বৃহস্পতি গ্রহের আরও ১২টি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছেন, এর ফলে বৃহস্পতির গ্রহের সংখ্যা দাঁড়াল ৭৯। তথ্যসূত্র – দা গার্ডিয়ান।

১৯শে জুলাই ঃ আমেরিকার ভারজিনিয়ার হাওয়ার্ড হিউজেস মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট এর বিজ্ঞানীরা মাছির মস্তিষ্কের নিউরনের গঠনের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ন্যানোস্কেলে দেখতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যসূত্র – ফিউ ওআরজি।

২০শে জুলাই ঃ বারমিংহাম এর ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালাব্যামা ঘোষণা করেছেন যে একটি ইঁদুরের বয়সজনিত কারণে চামড়া কুচকে যাওয়া ও চুল পড়ে যাওয়ার ঘটনাকে বিপরীতমুখী পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছেন। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি।

২৩শে জুলাই ঃ কানাডার ইউনিভার্সিটি অফ আলবারটা-র গবেষকরা খুব দ্রুত হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুকে সরানোর মাধ্যমে এমন এক প্রযুক্তির আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা কম্পিউটার এ ব্যবহৃত সলিড স্টেট মেমরির ক্ষমতা ১০০০ গুণ বাড়াতে সক্ষম। তথ্যসূত্র – নেচার কমিউনিকেশান।

২৫শে জুলাই ঃ ব্রাজিলের সাও পাওলো রিসার্চ ফাউন্ডেশান এর সেন্টার ফর কম্পুটেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স এর গবেষকরা হেমাটাইট থেকে প্রাপ্ত দ্বিমাত্রিক মেটেরিয়াল হেমাটিন এর বর্ণনা দিয়েছেন যা ফোটোক্যাটালিস্ট হিসাবে প্রয়োগ করা যাবে। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি।

২৭শে জুলাই ঃ একুশ শতকের সবচেয়ে বড় চন্দ্রগ্রহণ হল যা ব্লাড মুন হিসাবে পরিচিত। তথ্যসূত্র – বিবিসি।

২৮শে জুলাই ঃ চোখের সঞ্চালনের প্রকৃতি দ্বারা ব্যক্তিত্বের ধরন নির্ধারণ করার পদ্ধতি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দ্বারা করে দেখালেন ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ অস্ট্রেলিয়ার গবেষকরা। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি।

৩১শে জুলাই ঃ আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশান এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একটি ব্রাউন ডোয়ার্ফ এর থেকে ভীষণ শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্র ও অরোরা দেখতে পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – অ্যাস্ট্রোনমি ডট কম।

অগাস্ট ২০১৮

১লা অগাস্ট ঃ গবেষণাগারে প্রস্তুত কৃত্রিম ফুসফুস সফল ভাবে শুকরের দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যসূত্র – সায়েন্স।

৭ই অগাস্ট ঃ নাসার গবেষকরা সৌরজগতের বাইরের ধারে হাইড্রোজেনের এক দেওয়ালের উপস্থিতির কথা নিশ্চিত করেছেন নিউ হরাইজন মহাকাশ যানের পাঠানো তথ্যের মাধ্যমে, যা প্রথম চিহ্নিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। তথ্যসূত্র – লাইভ সায়েন্স।

৯ই অগাস্ট ঃ চীনের গবেষকরা অরগানিক ফটোভোলটিক সেল বানিয়েছেন যা ফটোভোলটিক সেলের দক্ষতা প্রায় ২.৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে। তথ্যসূত্র – বিবিস নিউজ।

১২ই অগাস্ট ঃ নাসা ডেল্টা IV হেভির মাধ্যমে পার্কার সোলার প্রোবকে সূর্য ও সৌর ঝড় সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করল। তথ্যসূত্র – দা নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১৪ই অগাস্ট ঃ কম্পিউটার গবেষকরা ফোরশ্যাডো নামক এমন এক সিকুরিটি ভালনারিটির আবিষ্কার করেছেন যা পারসোনাল কম্পিউটার ও থার্ড পার্টি ক্লাউড এ ব্যবহৃত ইন্টেল প্রসেসর কে প্রভাবিত করতে পারে। তথ্যসূত্র - পি সি ম্যাগাজিন।

১৬ই অগাস্ট ঃ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটেরির বিজ্ঞানীরা গ্যাসীও ডয়টেরিয়ামকে তরল ধাতবে রূপান্তর করতে সক্ষম হয়েছেন,

এর ফলে গবেষকরা বিভিন্ন বৃহৎ গ্যাসীও গ্রহ যেমন বৃহস্পতি বা শনি বা এই সম্পর্কিত সৌর মণ্ডলের বাইরের গ্রহ বিশেষের চুম্বকীয় ক্ষেত্রের ওপর আরও ভালো ভাবে গবেষণা করতে পারবেন। তথ্যসূত্র – দা নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১৬ই অগাস্ট ঃ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার সান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরির প্ল্যাটিনাম ও সোনার এমন এক সংকর ধাতুর উদ্ভাবন করেছেন যা ইস্পাতের থেকেও ১০০ গুণ বেশি সহনশীল। তথ্যসূত্র - সান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরি।

২০শে অগাস্ট ঃ ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিস্টল এর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জেনেটিক ও ফসিল এর মাধ্যমে গবেষণা করার দ্বারা জানতে পেরেছেন যে পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব সম্ভবত হয়েছে ৪৫০ কোটি বছর আগে। তথ্যসূত্র – ফিজ ডট ওআরজি।

২১শে অগাস্ট ঃ আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ হাওয়াই এর বিজ্ঞানীরা চাঁদের অন্ধকার দিকে থাকা জল ও বরফের এই প্রথম সন্ধান পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেক্যালার্ট।

২২শে অগাস্ট ঃ সাইবেরিয়ার অ্যানুই নদীর তীরে গবেষকরা এক ৯০০০০ হাজার বছরের পুরানো ১৩ বছর বয়সী এমন এক কিশোরীর জীবাশ্ম পেয়েছেন যার মধ্যে নিয়ান্ডারথাল এবং ডেনিসোভান দুই ভিন্ন ধরনের মানুষের জিন পাওয়া গেছে, এটি একটি অভিনব আবিষ্কার। তথ্যসূত্র – দা নিউ ইয়র্ক টাইমস।

২৮শে অগাস্ট ঃ পদার্থবিজ্ঞানীরা হিগস-বোসন ভেঙ্গে বটম কোয়ার্ক এ পরিণত হওয়াকে এই প্রথম পর্যবেক্ষণ করলেন। তথ্যসূত্র – সার্ন।

৩০শে অগাস্ট ঃ চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অফ হংকং এর গবেষকরা ন্যানোবোট কে নিয়ন্ত্রণ করার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা ন্যানোবোটকে দিয়ে অনেক জটিল কাজ কর্ম করানো সম্ভব হবে। তথ্যসূত্র – চাইনিজ ইউনিভার্সিটি অফ হংকং।

সেপ্টেম্বর ২০১৮

৬ই সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় এর গবেষকরা সাহারা মরুভূমিতে খুব বড় আকারের সৌর প্যানেল ও বায়ু টারবাইন এর মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলটির সবুজায়ন করার জন্য অধ্যয়ন করছেন। তথ্যসূত্র – বিবিসি।

৭ই সেপ্টেম্বর ঃ ন্যাশনাল জিওস্পেসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি গবেষকরা আনটার্কটিকার একটি উচ্চ মানের মানচিত্র প্রকাশ করেছেন যার নাম দিয়েছেন রেফারেন্স এলিভেশান মডেল অফ আনটার্কটিকা। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১০ই সেপ্টেম্বর ঃ ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে "ডেন্স অবজেক্ট নেট" নামক একটি নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে যার দ্বারা কোন রোবট কোন বস্তুকে শুধুমাত্র দেখার মাধ্যমে সেটির সম্বন্ধে অনেক বেশি তথ্য ও সেটি কি কারণে ব্যবহৃত হয় তার সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি।

১২ই সেপ্টেম্বর ঃ নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অফ বারজেন এর ভূতত্ত্ববিদরা দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গুহা থেকে প্রায় ৭৩০০০ হাজার বছরের পুরানো গুহাচিত্রের আবিষ্কার করেছেন যেটি কোন মানুষের আঁকা এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচাইতে পুরানো গুহাচিত্র। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

১৫ই সেপ্টেম্বর ঃ নাসা আইসিইস্যাট-২ নামক বরফ পর্যবেক্ষণকারী এখন পর্যন্ত প্রযুক্তিগত ভাবে সবচাইতে উন্নত মহাকাশ যানের কথা ঘোষণা করেছে। তথ্যসূত্র – নাসা।

১৬ই সেপ্টেম্বর ঃ লিভারপুলের জন মুরস ইউনিভার্সিটির মহাকাশবিদরা মহাবিশ্বের মিসিং ম্যাটার (ডার্ক ম্যাটার নয়) ওয়ার্ম হট ইন্টারগ্যালাক্টিক মিডিয়াম এর মাঝে থাকতে পারে বলে মনে করছেন। তথ্যসূত্র – ওয়ারড।

২০শে সেপ্টেম্বর ঃ আমেরিকার সিনসিনাটি চিলড্রেন'স হসপিটাল মেডিক্যাল সেন্টার এর গবেষকরা প্লুরিপটেন্ট স্টেম সেল থেকে অসোফেগ্যাল টিস্যু বানাতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যসূত্র – সিনসিনাটি চিলড্রেন'স হসপিটাল মেডিক্যাল সেন্টার।

২০শে সেপ্টেম্বর ঃ স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন এর গবেষকরা এই প্রথম মানুষের কঙ্কালের স্টেম সেল পর্যবেক্ষণ করেছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকা এলার্ট।

২১শে সেপ্টেম্বর ঃ জাপানের হায়াবুসা-২, অ্যাস্টেরয়েড রিয়ুগুর ওপরে দুটি যানের অবতরণ ঘটিয়েছে। তথ্যসূত্র – স্পেস ডট কম।

২৫শে সেপ্টেম্বর ঃ গবেষকরা দেখেছেন যে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড যাদের হৃদপিণ্ড সংক্রান্ত রোগের ইতিহাস আছে বা ডায়াবিটিস আছে তাদের হার্ট অ্যাটাক বা হার্ট সংক্রান্ত রোগের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দিতে পারে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস।

২৫শে সেপ্টেম্বর ঃ জুলজি সোসাইটি অফ লন্ডন এর গবেষকরা মাদাগাস্কার দ্বীপে ভরম্বি টাইটান নামক একধরনের বিশালকায় পাখির খোজ পেয়েছেন যার ওজন ৮০০ কেজি ও উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। এটি আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত সবচাইতে বড়

পাখি। তথ্যসূত্র – ইউরেকা এলার্ট।

২৬শে সেপ্টেম্বর ঃ ইউনিভার্সিটি অফ হাওয়াই এর গবেষকরা প্রাণের জন্য প্রয়োজন ফসফরাস যৌগ যে মহাশূন্যেই প্রথম তৈরী হয়েছে এবং সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছিল এমনকি পৃথিবীতেও ছড়িয়ে পরেছিল তার প্রমাণ পেশ করেছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকা এলার্ট।

অক্টোবর ২০১৮

১লা অক্টোবর ঃ আমেরিকার জেমস পি আলিসন ও জাপানের তাসুকু হনজোকে ক্যানসারের ওপরে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তথ্যসূত্র – দ্য নোবেল প্রাইজ।

২রা অক্টোবর ঃ আমেরিকার আর্থার আশকিন, ফ্রান্সের জেরার্ড মউরউ এবং কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যাডকে লেজার ফিজিক্স-এ অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তথ্যসূত্র – দ্য নোবেল প্রাইজ

২রা অক্টোবর ঃ ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির গাইয়া মিশন থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে মহাকাশবিদরা জানতে পেরেছেন যে একটি উচ্চগতি সম্পন্ন নক্ষত্র অন্য একটি নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মিল্কিওয়ের দিকে এগিয়ে আসছে। তথ্যসূত্র – রয়াল অ্যাস্টনমিকাল সোসাইটি।

৩রা অক্টোবর ঃ আমেরিকার ফ্রান্সিস এইচ আর্নল্ড এবং জর্জ পি স্মিথ এবং ইউনাইটেড কিংডম এর গ্রেগরি পি উইন্টার কে রসায়নে অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তথ্যসূত্র – দ্য নোবেল প্রাইজ।

৪ঠা অক্টোবর ঃ ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা প্ল্যানেট সিমুলেটার নামে এমন এক প্রযুক্তির উদ্ভাবন করেছেন যা দিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল সে সংক্রান্ত পড়াশোনা আরও বিশদে করা যাবে। তথ্যসূত্র – ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি।

৮ই অক্টোবর ঃ লরেন্স বার্কলে ন্যাশনাল ল্যাবোরেটরির গবেষকরা নিম্ন তাপমাত্রায় সাধারণ জৈব যৌগ থেকে জটিল পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তৈরি হওয়ার রাসায়নিক পথ আবিষ্কার করেছেন। এই আবিষ্কারের দ্বারা শনির উপগ্রহ টাইটান-এ কিভাবে পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন এলো তা জানতে সুবিধা হবে। এই ধরনের পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তৈরি প্রাণ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্কিত। তথ্যসূত্র – নেচার অ্যাস্ট্রোনমি।

১০ই অক্টোবর ঃ অস্ট্রেলিয়ান স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যারে পাথফাইন্ডার নামক রেডিও টেলিস্কোপ মহাকাশে **১৯টি** ফার্স্ট রেডিও বার্স্ট পর্যবেক্ষণ করেছে। তথ্যসূত্র – স্পেস ডট কম।

১১ই অক্টোবর ঃ ইন্সটিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, পোলিশ অ্যাকাডেমির গবেষকরা রিপোর্ট করলেন যে একটি কণার কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে ব্যাখ্যা সম্ভব কিন্তু অনেকগুলি কণার ক্ষেত্রে এটা সম্ভব না। তথ্যসূত্র – ফিজিক্যাল রিভিউ।

১১ই অক্টোবর ঃ কানাডার কিউবেক এর "ইন্সটিটিউট ন্যাশনাল দে লা রিসার্চে সায়ান্টিফিকে"র গবেষকরা পৃথিবীর সবচাইতে দ্রুত ক্যামেরার আবিষ্কার করেছেন যা প্রতি সেকেন্ডে ১০ ট্রিলিয়ান ফ্রেমকে ধরে রাখতে পারে। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি।

১৬ই অক্টোবর ঃ দ্য ল্যান্সেট নামক মেডিক্যাল জার্নাল-এ প্রকাশিত যে ২০৪০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে মানুষের জীবনকাল বৃদ্ধি পাবে। তথ্যসূত্র – ইউরেকা এর্লাট।

২০শে অক্টোবর ঃ ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আর জাপান এরোস্পেস এক্সপ্লোরেশান এজেন্সির গবেষকরা যৌথভাবে বুধ গ্রহের ওপর বেপি কলম্বো নামক একটি প্রোব শুরু করলেন। তথ্যসূত্র – ইউরোপিয়ান স্পেচ এজেন্সি।

২৪শে অক্টোবর ঃ আমেরিকার আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশান ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স এর গবেষকরা টেক্সাস এ এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত পৃথিবীর সবচাইতে প্রাচীন অস্ত্র আবিষ্কার করেছেন, এটি প্রায় **১৩৫০০** থেকে **১৫৫০০** বছরের পুরানো। তথ্যসূত্র – ফিজ ডট ওআরজি।

৩০শে অক্টোবর ঃ স্পেন, ইজরায়েল ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানীদের একটি দল নিয়াভারথাল দের বুকের পাঁজরের ত্রিমাত্রিক ভার্চুয়াল রিকন্সট্রাকশান করেছেন যার ফলে নিয়ান্ডারথালরা কিভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেত আর কিভাবে নিশ্বাস নিত সেই সম্বন্ধে আরও ভালো ভাবে জানতে পারবে। তথ্যসূত্র – নেচার কমিউনিকেশান।■

ঃ সংগঠন সংবাদ ঃ

এই পর্যায়ে আমাদের কর্মীরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যা এবং জিজ্ঞাসার কথা জেনেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মূল উৎস কী তার যথাসাধ্য ব্যাখ্যা রাখার প্রয়াস নিয়েছেন, জনসাধারণের নানা জিজ্ঞাসার সমাধান দেওয়া এবং তাকে বিজ্ঞান মনস্ক করার প্রয়াস নিয়েছেন। এই পর্যায়ে যে গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানগুলি হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ ঃ

গত ২৬শে অগাস্ট পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলে বার্ষিক সচেতনামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে অলৌকিকতা বিরোধী প্রদর্শন, প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংকে নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী হয়। এরপর হয় "ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে বিজ্ঞানের প্রসারে সরকারের ভূমিকা সদর্থক" মোশনের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে ২জন মোশনের পক্ষে এবং ৩ জন মোশনের বিপক্ষে মতামত রাখেন। বিপক্ষের বক্তাদের কাছ থেকেই অধিক শক্তিশালী মতামত উঠে আসে। অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে বক্তাদের যুক্তিপূর্ণ মতামতে। এরপর সংগঠনের পক্ষ থেকে সেমিনার হয় 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও তার মোকাবিলা' শীর্ষক বিষয়ে। এই সেমিনারে কেরালার সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যার কারণ ও শাসকশ্রেণীর ভূমিকা সমালোচিত হয়। সেমিনারটিতে উপস্থিত দর্শকরা খুব মন দিয়ে শোনেন এবং সেমিনার শেষে প্রশ্নোত্তরের আসরে অনেকেই অংশ নেন।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সোনারপুরের তেঘরিয়া স্কুলে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয় সেমিনার করা হয়। সেমিনারে জ্যোতিষশাস্ত্রের উৎপত্তি এবং তা যে একটি অপবিজ্ঞান এবং লাভজনক কারবার তা উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরা হয়, পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় রাখা হয়। এরপর সাম্প্রতিক প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং-এর উপর তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ১লা অক্টোবর কলকাতার ঠাকুরপুকুর অঞ্চলের কদমতলার নেতাজি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদে একটি গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে অলৌকিকতা বিরোধী প্রদর্শনী হয়। এরপর জ্যোতিষশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এরপর মহাবিশ্বের পরিচয় নিয়ে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

গত ৭ই নভেম্বর কলকাতার সুবর্ণ বণিক হলে রুশ সর্বহারা অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০২তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান মনস্ক'র কর্মীরা সামিল হন।

গত ১১ই নভেম্বর কোচবিহার জেলার কুচলিবাড়ি থানার ডাঙারহাটে স্থানীয় একাদশ ক্লাবের সহযোগিতায় একটি অলৌকিকতা বিরোধী এবং বিজ্ঞান সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে গ্রামের প্রচুর মানুষ সমাবেশিত হয়েছিল। অলৌকিকতা বিরোধী অনুষ্ঠানে ভাল সাড়া মিলেছে। কবিরাজ-গুরুজী-মাতাজী-রা জন্ডিস সারানোর নামে, চোর ধরার নামে, মনের কথা জানার নামে যেসব 'অলৌকিক' কান্ড করে দেখান সেগুলি যে তারা বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েই করেন তা প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরা হয়। সাপ প্রসঙ্গে মানুষকে সচেতন করা এবং সাপে কামড়ালে করণীয় বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এরপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং তার মোকাবিলা শীর্ষক সেমিনার হয়।

গত ১৩ই নভেম্বর শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে হাতিয়াডাঙায় গ্রামীণ পরিবেশে 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' শীর্ষক সেমিনার করা হয়।

শারদীয়া উৎসবের সময় **উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বনগাঁ**-তে এবং **দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোচরণ** স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চলে সমীক্ষণের স্টল দেওয়া হয়। নভেম্বর মাসের ১৬-১৮ তারিখ **দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা বাজারেও** সমীক্ষণের স্টল দেওয়া হয়। এই স্টলগুলিতে সমীক্ষণ এবং বিজ্ঞানের বই সংগ্রহের আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। ■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮

Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com